বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২১ ▪ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বিজয়ের ৫০ বছর

পঞ্চাশে বাংলাদেশ: এক অসামান্য সাফল্যের নাম

আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন

বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ

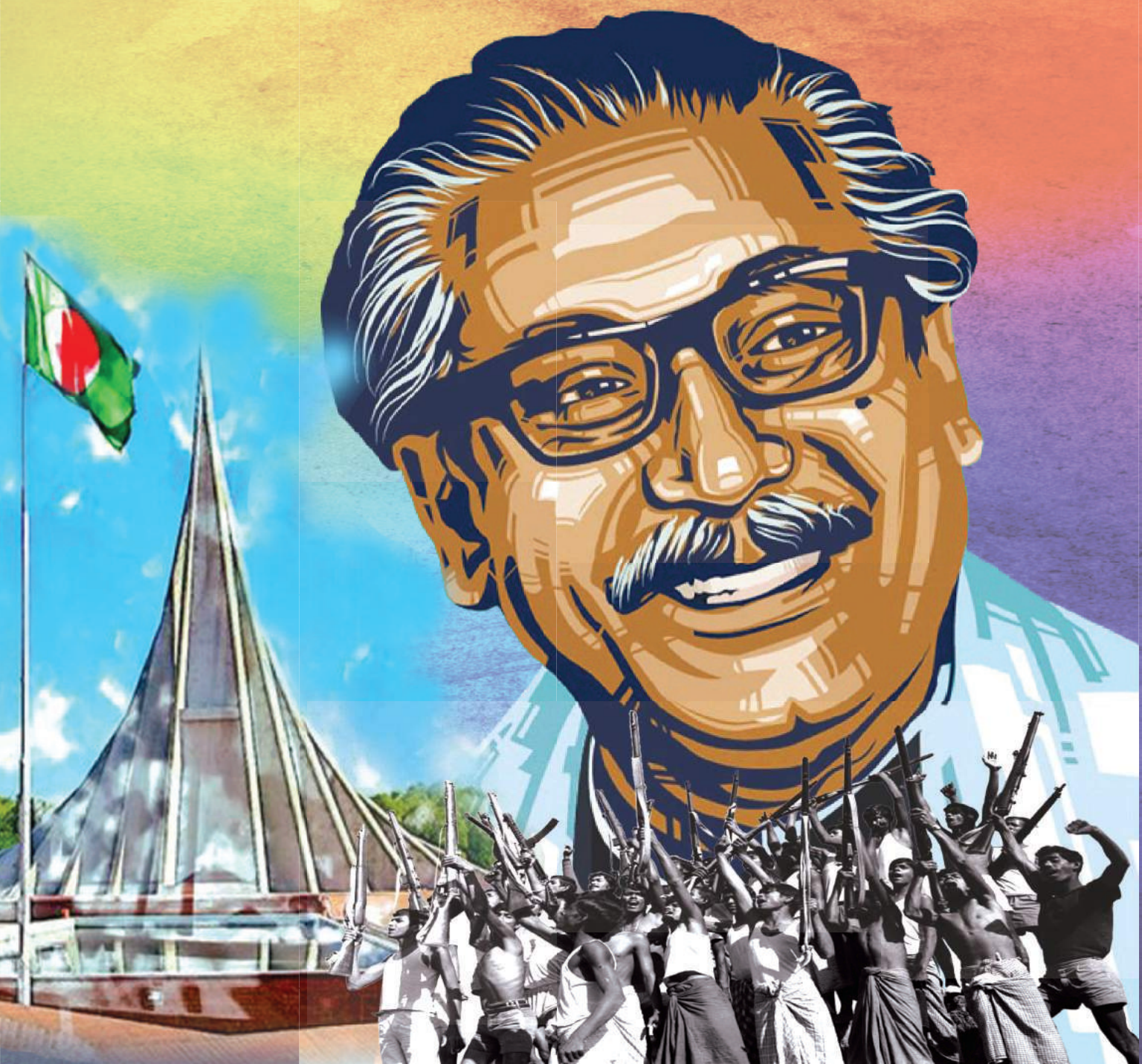

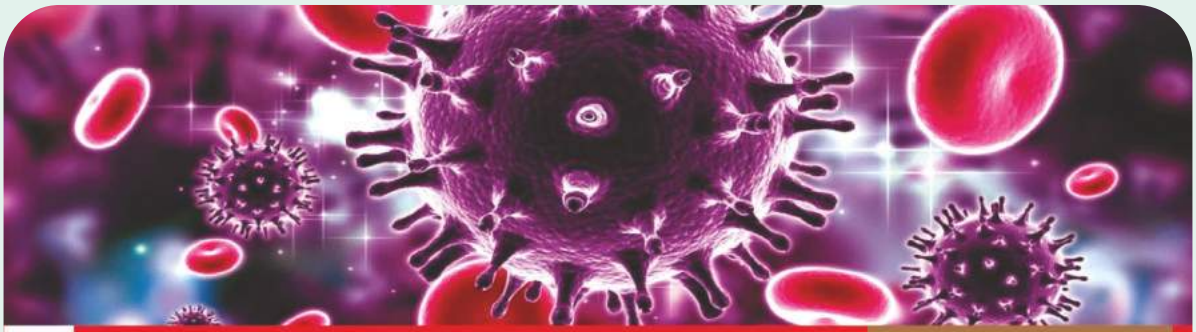

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০২১ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৮

জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা

সম্পাদকীয়

১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় বাঙালি শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বিভিন্ন সময় এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। তবে তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে যুদ্ধের শেষ সময়ে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিকে মেধাশূন্য করতে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে [বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ আর দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় দিবসের ৫০ বছর উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে ২০২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে চলছে এর প্রস্তুতি। মহান বিজয়ের ৫০ বছরে গভীর শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী এবং নির্যাতিত মা-বোনদের। বিজয়ের ৫০ বছর উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা।

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও সমাজসংস্কারক। তিনি বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষা, অধিকার আদায় ও নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম পথিকৃৎ। বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। রোকেয়া দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

১০ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর থেকে দিবসটি পালন করে আসছে। বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দিবসটি পালন করা হয়। বাংলাদেশেও এ দিবসটি ১০ই ডিসেম্বর নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়ে থাকে। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, কবিতা ও নিয়মিত প্রতিবেদন নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* ডিসেম্বর ২০২১ সংখ্যা। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সাক্ষাৎকার

পঞ্চাশে বাংলাদেশ: এক অসামান্য সাফল্যের নাম ৪
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

স্মৃতির আয়নায় ৭১-এর বিজয় দিবস ৬
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন ৯
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুজিব-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ১৩
জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ

আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ১৬
জাফর ওয়াজেদ

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ১৮
ড. মোহাম্মদ হাননান

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ২১
প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

শক্তপোক্ত হোক চতুর্থ স্তম্ভ ২৪
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী শিক্ষা ভাবনা ২৭
ড. মো. আব্দুস সামাদ

বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ ৩০
আমীরুল ইসলাম

মানুষের অধিকার ৩৩
শ্যামল দত্ত

বঙ্গবন্ধুর ধর্মাচরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতা ৩৬
রহিম আব্দুর রহিম

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যা ৩৯
কে সি বি তপু

মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ৪২
শহিদুল ইসলাম

নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা বেগম রোকেয়া ৪৪
ইমরান পরশ

শহিদ ফুটবলার মজিবর রহমান ৪৬
মিয়াজান কবীর

প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের পদক্ষেপ ৪৭
নওশান আহমেদ

গল্প

নছিমন বিবির গোয়েন্দাগিরি ৪৯
আ. শ. ম. বাবর আলী

সহযোদ্ধা ৫১
সিরাজউদ্দিন আহমেদ

গল্প

আকাশ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবা ৫৩
আখতারুল ইসলাম

কবিতাগুচ্ছ ৫৫-৬০

সোহরাব পাশা, শেখ সালাহ্উদ্দীন, ফারুক নওয়াজ, প্রণব মজুমদার, সাঈদ তপু, বেগম শামসুন নাহার, বাবুল তালুকদার, জগলুল হায়দার, জাহানারা জানি, সেহাঙ্গল বিপ্লব, কামাল হোসাইন, অমিতাভ মীর, শামীমা চৌধুরী, আবদুল আলীম তালুকদার, এম ইব্রাহীম মিজি, সত্যজিৎ বিশ্বাস, গোলাম নবী পান্না, মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, অমিত কুমার কুণ্ডু, মোহাম্মদ আলী, রকিবুল ইসলাম, শচীন্দ্র নাথ গাইন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬১
প্রধানমন্ত্রী ৬২
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৩
আন্তর্জাতিক ৬৪
উন্নয়ন ৬৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৫
শিক্ষা ৬৬
শিল্প-বাণিজ্য ৬৭
বিনিয়োগ ৬৭
নারী ৬৮
সামাজিক নিরাপত্তা ৬৯
কৃষি ৬৯
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭১
বিদ্যুৎ ৭১
নিরাপদ সড়ক ৭২
স্বাস্থ্যকথা ৭৩
যোগাযোগ ৭৪
কর্মসংস্থান ৭৪
সংস্কৃতি ৭৫
চলচ্চিত্র ৭৫
মাদক প্রতিরোধ ৭৬
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৬
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৭
প্রতিবন্ধী ৭৮
ক্রীড়া ৭৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি: কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক
চলে গেলেন না ফেরার দেশে ৮০

অপরাজেয় বাংলাদেশ ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

বিজয়ের ৫০ বছর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকলক্ষেত্রে বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, অতঃপর ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রহসন, ১৯৭১ সালের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস বাঙালি গণহত্যা, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, মুজিবনগর সরকার গঠন, নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় লাভ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করে এবং বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে (মুজিববর্ষ) বাংলাদেশ মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বে শুধু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই করেননি, তিনি একইসঙ্গে তাঁর দেশ পরিচালনার স্বল্পকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতকরণ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ করেছেন সুনিপুণভাবে। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির দেশি-বিদেশি চক্রান্তে কয়েকজন সেনাসদস্য কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার শহিদ হন বঙ্গবন্ধু। শারীরিকভাবে বঙ্গবন্ধু নেই কিন্তু বাংলাদেশের সর্বস্তরে রয়েছে তাঁর স্পর্শ ও আদর্শ। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় ও বাংলাদেশ একইসূত্রে গাঁথা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমনা ও উন্নয়ন-অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। বাংলাদেশের বিজয়ের সার্থকতা রয়েছে এর অগ্রগতি ও উন্নয়নে। মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'পঞ্চাশে বাংলাদেশ: এক অসামান্য সাফল্যের নাম', 'স্মৃতির আয়নায় ৭১-এর বিজয় দিবস', 'বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন', 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুজিব-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি', 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন', 'মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী শিক্ষা ভাবনা', 'বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধুর ধর্মাচরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতা', 'মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যা', 'মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. ৪, ৬, ৯, ১৩, ১৬, ১৮, ২১, ২৭, ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

পঞ্চাশে বাংলাদেশ: এক অসামান্য সাফল্যের নাম

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে আজকের বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অভিযাত্রার গতিময়তার কারণে বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। করোনার এই মহাসংকটকালেও জোরকদমে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের প্রবৃদ্ধি গেল বছর যখন পাঁচ শতাংশের মতো কমে গেছে, বাংলাদেশে সেই হার ঐ সময় পাঁচ শতাংশের বেশি হয়েছে। চলতি বছরে তা সাত শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানত আমাদের কৃষি খাত, প্রবাসী আয় এবং রপ্তানি খাত বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির হারের দেশে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। আধুনিক কৃষকসহ আমাদের ছোটো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের পরিশ্রম এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্য সরবরাহের কারণেই এই অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এই দুঃসময়েও ডিজিটাল ব্যাবসায় আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের নতুন করে উদ্যোগী হওয়ার প্রচেষ্টা দেখে সত্যি এই সাহসী বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদী হতে ইচ্ছে করে। বাংলাদেশের উত্থানের এই গল্পে নারীর শিক্ষা ও কর্মে এগিয়ে আসার বিষয়টি সবার আগে চলে আসে। আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে ৩৬ শতাংশ নারীর উপস্থিতি, নারীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং সকল পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় সকল উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে আলাদা করে চেনাতে সাহায্য করছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে দারিদ্র্য নিরসনে এবং নারীর ক্ষমতায়নে। নানা সামাজিক সূচকে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই রূপান্তরের পেছনে সরকারি বিচক্ষণ নীতি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যমী ভূমিকার কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সবাই মিলেই আমরা বাংলাদেশকে গত পাঁচ দশকে এই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে এনে দাঁড় করাতে পেরেছি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এখন চোখে পড়ার মতো। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ– এই উন্নয়ন যাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতিশীল উন্নয়ন– এটি অনেকটা স্বপ্নের মতো। অনেকের ভাবনাতেই ছিল না বাংলাদেশ এভাবে এগিয়ে যাবে। আর্থসামাজিক সব সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বে নজর কাড়তে সক্ষম হবে।

ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশলের মধ্যে আনার বড়ো কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বুকে ধরে যিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বেই দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, পোশাক ও ওষুধ শিল্পের অগ্রগতিও হয়েছে সমান্তরালে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল– এসব মেগা প্রকল্পগুলো এখন প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান হচ্ছে। মানুষের ক্রয় সক্ষমতা আগের চেয়ে এখন বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতিও এখন আরও সবল। সেবা খাতগুলোতেও এসেছে বহুধা পরিবর্তন। ঘরে বসেই এখন দরিদ্র মানুষেরা সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বিভিন্ন সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারছে। এই সামগ্রিক পরিবর্তনের মাঝে প্রস্ফুটিত হচ্ছে গতিময় নতুন এক বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের উদ্ভাবনীমূলক উন্নয়ন মডেলের জয়জয়কার। তার মানে এই নয় যে, আমাদের সমস্যা নেই। নিশ্চয় আছে। আগেও ছিল। তা সত্ত্বেও থেমে নেই বাংলাদেশ। পরিশ্রমী মানুষ এবং সুদূরপ্রসারী বিচক্ষণ নেতৃত্বের গুণে এতসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সফলতার এক অনন্য সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে এই আরেক বাংলাদেশের সাফল্যের নানা গল্প বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে।

গত ১০ই মার্চ কলামিস্ট নিকোলাস ক্রিস্টফ বিশ্ব বিখ্যাত *দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমসে* লিখেছেন যে, দারিদ্র্য কী করে কমাতে হয় তা বোঝার জন্য বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে পারে। বিশেষ করে নারীশিশুকে শিক্ষিত করে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কী করে এত অল্প সময়ের মধ্যে তীব্র দারিদ্র্য নিরসন করে এমন মাথা উঁচু করে তর তর করে উন্নয়নের মহাসড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে– তা সত্যি অনুসন্ধানের বিষয়।

কলামিস্ট নিকোলাস ক্রিস্টফ পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক। তাঁর মতে, গরিব মানুষের পেছনে বিনিয়োগ করেই বাংলাদেশ এই সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষার অবারিত সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে নারীশিশুরা বেশি করে সরকারের দেওয়া শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করছে। যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি হারে এগিয়ে। এই মেয়েরাই এখন গ্রাম থেকে শহরে এসে পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানায় কাজ করছে। আঠারো বছরের আগে বিয়ে না করে তারা আনুষ্ঠানিক কর্মে যুক্ত হচ্ছে। কাজ করে করেই তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাই তাদের দক্ষতাও বাড়ছে। আর বাড়ছে উৎপাদনশীলতা। সরকার এবং সরকারের বাইরের অনেক সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান মিলেই নারীর শিক্ষা এবং দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কর্মজীবী এই নারী শুধু তাদের পরিবারের দারিদ্র্য ঘোচাচ্ছে সেটিই গল্পের পুরোটা নয়। একইসঙ্গে তারা তাদের পরিবারে ও সমাজে

নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে বেগবান করছে। নিজেদের ভাইবোন ও সন্তানদের পড়ালেখার সুযোগও করে দিচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে পরিবারের ভোগের স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে। গ্রামীণ চাহিদা চাঙা করে রেখেছে। বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ছাড়াও বোনেদের ও মায়েদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বাঁচবার সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

এবারের মার্চে মহামারির মধ্যেও যুগপৎ মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে বাংলাদেশ। এমন সময়ে এমন প্রশংসনীয় কথা শুনতে কার না ভালো লাগে। তাও আবার বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যম থেকে। মাত্র কদিন আগেই আরেক বিখ্যাত মার্কিন *দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* লিখেছে যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গতিময় ('বুল রানিং কেইস') দেশ হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের মতো রপ্তানি নির্ভরশীল এশীয় উন্নয়ন মডেলের প্রতিচ্ছবি বাংলাদেশের মাঝে এই পত্রিকার কলামিস্ট দেখতে পাচ্ছেন। মাথাপিছু আয় এবং ক্রমবর্ধমান রপ্তানি আয়ের ওপর ভর করে বাংলাদেশ এমন চমকে দেওয়া উন্নয়নের গতিময় ধারা সচল রেখেছে বলে তিনি মনে করেন।

এর আগে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা *ব্লুমবার্গ* পরিচালিত কোভিড-১৯ সংকট ব্যবস্থাপনার সাফল্য মাপার ব্লুমবার্গ রেজিলিয়েন্স সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম বিশটি দেশের তালিকায় নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছে। করোনা প্রতিরোধের টিকা ব্যবস্থাপনাতেও বাংলাদেশ দারুণ পারফর্ম করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নেতৃত্বের গুণেই যে বাংলাদেশ এমন অসামান্য সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। তাই তো কমনওয়েলথ মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কমনওয়েলথ অঞ্চলের তিন সফলতম নারী নেত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাহাত্তরের দিকে ফিরে তাকানো যাক একটু। ১০ই জানুয়ারি নিজ ভূমিতে পা রাখলেন বঙ্গবন্ধু। জনসভায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেন আর মানুষকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করলেন। তাঁর কাছে তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত এক পোড়া বাংলাদেশ। চারদিকে হাহাকার, কান্না, দ্রোহ। লাখো শহিদের রক্তস্নাত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে শূন্য হাতেই বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করলেন। এক ডলারও রিজার্ভ নেই। রাস্তাঘাট, সেতু, রেল, বন্দরসহ প্রায় সকল অবকাঠামো বিধ্বস্ত। এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন করতে হবে। কৃষি ও শিল্পের পুনর্নির্মাণ করতে হবে। তিনি দমলেন না। উদ্যোক্তাবিহীন বাংলাদেশে শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ ছিল অবধারিত। কৃষির আধুনিকায়নে তিনি উন্নত বীজ, সার ও সেচের ব্যবস্থা করলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুললেন। কুদরত-ই-খুদা কমিশন করে উপযুক্ত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তৎপর হলেন। দক্ষ জনশক্তি গড়তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিলেন। সকলের সাথে বন্ধুত্বের কূটনীতি চালু করে বাংলাদেশকে সুপরিচিত করলেন। বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্য হলো বাংলাদেশ। দ্রুতই সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করে পরিকল্পিত উপায়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ করার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। বৈদেশিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বৈরী যুক্তরাষ্ট্রের নানা ষড়যন্ত্রে অনেক কিছুই থমকে যেতে থাকে। তবুও এসব মোকাবিলা করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পে স্থির থাকে। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই মাথাপিছু আয় ৯৩ ডলার থেকে ১৯৭৫-এ ২৭৩ ডলারে উন্নীত হয়। কৃষি উৎপাদনে গতি আসতে শুরু করে। সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। আইনশৃঙ্খলা সুরক্ষা এবং সাম্যের অর্থনীতি পরিচালনার জন্য বিকেন্দ্রায়িত প্রশাসন ও অর্থনীতি পরিচালনার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর এই অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয় ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। শারীরিকভাবে হারিয়ে ফেলি তাঁকে। কিন্তু তিনি থেকে যান আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে। নির্বাচনে ষড়যন্ত্রকারীদের পরাস্ত করে বঙ্গবন্ধুকন্যা ক্ষমতায় আসেন ১৯৯৬ সালে। বাংলাদেশ ফিরতে থাকে বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণের উন্নয়নের পথে। ব্যক্তি খাত ও সরকারি খাত মিলেমিশে উন্নয়নের এক ভারসাম্যময় কৌশল গ্রহণ করে বাংলাদেশ। সামাজিক সুরক্ষার নীতি চালু করা হয় গরিবদুখি মানুষের কল্যাণের জন্য। দেশ ফিরে আসতে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার পথে। ফের ছন্দপতন ২০০১ সালে। নানা আঘাত-আক্রমণ মোকাবিলা করে ফের বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশ পরিচালনার আসনে বসেন ২০০৯ সালে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

গত এক যুগে বাংলাদেশের বিস্ময়কর পরিবর্তন অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থনীতি ও সমাজে নানান পরিবর্তন নজর না কেড়ে পারে না। গ্রামগুলোতে গেলে বুঝা যায় কতটা বদলে গেছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ। রপ্তানি বেড়েছে চারগুণ। প্রবাসী আয় বেড়েছে তিনগুণের মতো। পঁচাত্তরের পর রেমিটেন্স বেড়েছে ২৮৫ গুণ এবং রপ্তানি বেড়েছে ১৩৩ গুণ। গত বারো বছরে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে প্রায় সাতগুণ। গত পঞ্চাশ বছরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, ১৯৭৫-পরবর্তী প্রবৃদ্ধির ৭৩ শতাংশই হয়েছে গত এক যুগে। গত পাঁচ দশকে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে চারগুণ। ব্যক্তি খাতে বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার অনুরূপ কম দক্ষ নারী শ্রমিকনির্ভর শিল্পায়ন বাংলাদেশকে প্রতিযোগী করে তুলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে আর্থিক খাত ও প্রশাসন গতিময় ও অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে। মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের গতি বেড়েছে। কৃষি আধুনিক হয়েছে। করোনাকালেও এই খাত ভালো করছে। ক্ষুদে ও মাঝারি শিল্পের দেওয়া প্রণোদনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্রবৃদ্ধির হার আরও বাড়বে। বিদ্যুতের প্রসার তো চোখেই পড়ছে। আগামী দিনে সবুজ বিদ্যুতের দিকে আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে। আগেই বলেছি, বাংলাদেশ কোভিড মোকাবিলায় সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে গড় আয়ু বাড়ছে, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, অপুষ্টির হার কমেছে। বেসরকারি খাত এবং সরকারি খাত মিলেই এই সাফল্য বয়ে এনেছে।

বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে অনেকেই বলছেন 'উন্নয়ন বিস্ময়'। কথাটা অসত্য নয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। গতিময় এক বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে। এই বাংলাদেশে আরও যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন আসন্ন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, dratiur@gmail.com

স্মৃতির আয়নায় ৭১-এর বিজয় দিবস

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে আমি কুমিল্লায় ছিলাম। সে রাতে আমাদের সাধ্যমতো প্রতিরোধ সত্ত্বেও শুধু ক্যান্টনমেন্টের নৈকট্যের কারণে কুমিল্লার স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারিনি। সেনানিবাস থেকে বের হয়ে এসে পাকিস্তানি হানাদাররা এলোপাতাড়ি গুলি চালায় ও পুলিশ লাইন্সে সুপরিকল্পিত হামলার মাধ্যমে কুমিল্লার কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। কুমিল্লা বিমানবন্দরে পরদিন থেকেই কমান্ডো নামতে শুরু করে। তারা বিমানবন্দরের আশপাশের গ্রামগুলোতে বোমা ও গুলিবর্ষণ করে ত্রাস ও হত্যার রাজত্ব কায়েম করে। তবুও আশপাশের এলাকাগুলোতে সংঘঠিত হয়ে পুলিশ, তদানীন্তন ইপিআর ও আনসারের সহায়তায় ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কুমিল্লা শত্রুমুক্ত করার প্রচেষ্টায় আমরা অনেকেই জড়িত ছিলাম। ৭ই এপ্রিল গোমতী নদী পার হয়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে সৈয়দ রেজাউর রহমান, রশিদ, রুস্তম, পাখীসহ কয়েকজনের সাথে দেখা হলো। তাদেরকে পেছনে রেখে আমি, কাশেম ও অপরাপর কয়েকজন ভারতীয় সীমান্তে গিয়ে সীমান্তের অপর পাড়ে পা রাখতে দ্বিধান্বিত ছিলাম। পাকিস্তান আমাদের মগজ এমনভাবে ধোলাই করেছিল যে আমরা ভাবতাম ভারত মানে হিন্দুর দেশ, হিন্দু মানে রাক্ষস-খোক্কস, সামনে গেলেই গিলে খাবে বা রায়ট করে মেরে-কেটে শেষ করে দেবে। কম্পমান পা ফেলে দুরু দুরু বুকে সীমান্ত অতিক্রম করলাম। তারপর থেকে ভিন্ন জীবন। বহুদিন চলে গেল। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন বুঝা গেল যে, যুদ্ধে যৌথ কমান্ডো গঠিত হচ্ছে তখন আমাদের অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মণি মুজিব বাহিনীকে দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের একটি এলাকা দখল করে সেখানে মুজিব নগর সরকারকে নিয়ে আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সে মোতাবেক শীর্ষস্থানীয় ও সুশিক্ষিত এক বাহিনী নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের সিদ্ধান্ত হয়। এই অভিযানে যেতে আমি জেদ ধরে বসি। মণি ভাই প্রথমে আমাকে নিতে নারাজ ছিলেন। তাঁর কতিপয় অকাট্য যুক্তি ছিল। তর্ক-বিতর্ক শেষে তিনি একটি যুক্তিতে আমাকে ঘায়েল করলেন। আমাকে সেক্টরের দায়িত্ব ও যৌথ কমান্ডো গঠিত হলে তাতে মুজিব বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধা ও সহযোগী নিয়ে আমি আগরতলা গ্লাস ফ্যাক্টরির বেস ক্যাম্পে রুটিন কাজ করতে লাগলাম। ডিসেম্বরের দুই তারিখ পাকিস্তানি সেভর জেট ফাইটার আগরতলায় আঘাত হানে। হয়ত মুজিব বাহিনীর প্রধান কার্যালয় গ্লাস ফ্যাক্টরি তাদের টার্গেট ছিল কিংবা যুদ্ধ বাধাবার মতলবে খামাখাই বোমাবাজি করল। দায়িত্বপ্রাপ্ত আমি সবাইকে নিয়ে বিমানাঘাত থেকে রক্ষার পথ খুঁজতে থাকি। ঐ দিনই ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিটি পুনর্জীবিত করা হয়। আশঙ্কায় বুক টিপ টিপ করতে থাকে।

ডিসেম্বরের তিন তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি আসন্ন জরুরি অবস্থার ইঙ্গিত দেন। তিনি শেখ মুজিবকে আপন ভাই এবং বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বক্তৃতা শেষ হবার আগেই পাকিস্তান দিল্লিতে বিমান হামলা দিয়ে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের সূচনা করে। মিসেস গান্ধী দিল্লি ফেরার আগেই ভারতীয় বিমানবাহিনী করাচি, লাহোরসহ পাকিস্তানের অনেকগুলো শহরে পালটা হামলা চালায়।

ডিসেম্বরে দুই-তিন তারিখে একটি যুদ্ধবিরতির জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে চার তারিখ তা শান্তি পরিষদে উত্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে ভেটো প্রদান করে। সেদিন থেকে নয় বার ভেটো প্রদান না করলে এক ধরনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়ে আমাদের বিজয় অনিশ্চিত হয়ে যেত।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে যৌথ কমান্ডোর ঘোষণা চূড়ান্ত হলো। সাথে সাথে যুদ্ধের কৌশল পালটে গেল। গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেল। তখন কামান কামানকে, ট্যাংক ট্যাংককে আর বিমান বহর বিমান বহরকে আঘাত করছে। মাটি কাঁপিয়ে, কান ফাটিয়ে ও চেতনায় চিড় ঘটিয়ে শক্তিশালী কামান ও ট্যাংক গর্জে উঠল। গেরিলা যোদ্ধাদের মনে হলো সিংহরাজের হাতে একটি ক্ষুদে মূষিক। গেরিলা যোদ্ধাদের দায়দায়িত্ব বদলে গেল। তাঁরা তখনও যৌথ কমান্ডের চোখ, কান ও মাথা। কুমিল্লার অদূরে কাঠালিয়ার কাছে স্মরণাতীত কালের ট্যাংক লড়াইয়ে পাকিস্তান বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পিছু হঠে গেল। একইভাবে বিবির বাজার, সালদা নদী ও আখাউড়ার ব্যাংকারগুলো গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হলে পাকিস্তান বাহিনী পশ্চাৎমুখী হলো। আমাদের গেরিলা ইউনিটগুলোর বেশ কটিই সীমান্ত এলাকায় ছিল। তাঁরা যেন কামান, ট্যাংক ও বিমানের খোরাক হয়ে না যায় তা দেখার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। চার তারিখে আখাউড়া ও পাঁচ তারিখে বিবির বাজার দিয়ে কুমিল্লা ঢোকার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আমার হাতের আমেরিকান পিস্তল ও যুগোস্লাভিয়ার রিভলভারকে নেহায়েত খেলনাসামগ্রী মনে হলো। ভারতীয় বাহিনীর দু'একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আমার পরিচয় জেনে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। তবুও ছয় তারিখে গোলাগুলির ফাঁক দিয়ে কুমিল্লার কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম বিজয় সন্নিকটে। ছয় তারিখে শহরের প্রায় চার মাইল দক্ষিণে এক গ্রাম পার হতে গিয়ে শুনলাম মা সে গ্রামে আছে। আমার বাবা আমার ছোটোবেলায় মারা যাওয়ায় অসহায় মা আমাকে ধরেই বেঁচেছিলেন। তার আশা ছিল, আমি তাঁর মুখোজ্জ্বল করব। তাই মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়াটাতে তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। এটা অস্বাভাবিকও ছিল না। কারণ আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত এবং বিদেশে পড়ার একটি বৃত্তি বলতে গেলে আমার হাতে। একটা শঠতার আশ্রয় নিয়ে ভারতে চলে যাই। ইতোমধ্যে

মা জেনেছে তার ছেলে নিখোঁজ। একবার মামা আমাকে দেখে গিয়ে মাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। তবে লোকমুখে অশুভ সংবাদও যে শুনেনি তা নয়। আমি গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। ভাবছি মা আমাকে জড়িয়ে ধরবে, বুকে টেনে নেবে। অনেকগুলো সশস্ত্র লোক দেখে হয়ত তিনি ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন কিনা বুঝলাম না। তাঁর উদাস দৃষ্টি ভাবান্তরবিহীন। মুখে উচ্চারণ করলেন– 'দেশের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহই রক্ষা করবে।' যুদ্ধ কবে শেষ হবে তিনি জানতে চাইলেন। আমি কোনো সদুত্তর দিতে পারলাম না। দ্রুত সে জায়গা ছেড়ে এলাম। সাত তারিখেও দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে ঢোকার উপায় ছিল না। তখনও রাজাকার ও পাকিস্তানিরা ভাবছে ভিন্ন কথা। আট তারিখে প্রচণ্ড শেলের আঘাতে শত্রু পক্ষ বিমানবন্দর এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করল। সেদিনই কয়েকবার গ্রামের পাশাপাশি গিয়ে আবার ফিরে আসলাম। বড্ড ইচ্ছা হলো আমাদের বাড়িটা দেখার। স্থল মাইনের ভয়ে আর যেতে পারলাম না– সারাটা গ্রামে তখনও কোনো জনপ্রাণীর সাড়া ছিল না।

সাত তারিখেই কেউ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে আবার কেউবা শহরের দিকে যাচ্ছে। শেষের দিকে গ্রাম অপেক্ষা শহরকে বরং মানুষের বেশি নিরাপদ মনে হতো। তবে শহরগুলোতে গুপ্ত হত্যার নীলনকশা সম্পর্কে আমাদের একটা অগ্রিম ধারণা ছিল। তাই আট তারিখে কুমিল্লা শহর মুক্ত হবার সাথে সাথে আমরা গুপ্ত হত্যা, লুটতরাজ বা দালাল ধরে টাকাপয়সা আদায়ের পথগুলো বন্ধ করতে তৎপর হলাম। শহরের প্রবেশ পথগুলোতে আমাদের ছেলেদের দিয়ে চেকপোস্ট বসানো হলো। আমি, তাহের, রুস্তম, পাখী, আলী ইমাম, কেনু ভাই, হিরন, কাশেম ও সেলিমসহ অনেককে নিয়ে চেকপোস্টগুলো পরিদর্শন করতাম। সেনানিবাসকে ঘিরে থাকা আমাদের গেরিলা ইউনিটগুলোকে রাতেরবেলা দেখতে যেতাম। একদিন নিজেদের বাহিনীর অ্যামবুশে নিজেরা পড়ে গিয়ে প্রায় শেষ হবার জোগার হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনীর সাথেও দু'এক জায়গায় ভুল বুঝাবুঝির সূচনা হলো।

মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা যখন শহরে ঢুকলো তখন জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তাঁদের দেখার জন্যে মানুষের ঢল রাস্তায় নামল। মানুষের ভালোবাসা ও ঘৃণা যে কত গভীর হয় তা এই যুদ্ধে দেখলাম। দোকানগুলোতে ভারতীয় মুদ্রায় কেনাবেচা শুরু হলো। আট তারিখে সিভিল প্রশাসন প্রতিষ্ঠা হবার কথা থাকলেও তা বিলম্বিত হলো। তখন থানাতে বা পুলিশ লাইন্সে পুলিশ ছিল না। ভয়ে ভয়ে সরকারি কর্মচারীরা গৃহে অবস্থান নিল। প্রশাসন না থাকলেও চুরি-ডাকাতি দেখা গেল না। আমরা কুমিল্লার রাজবাড়িতে আমাদের সহযোগী ভারতীয় ইউনিটটির অফিসের ব্যবস্থা করলাম ও নিজেরা আকবর-কবিরদের বাড়িতে অফিস স্থাপন করলাম। এখানে টেলিফোনের অফিসে অনবরত লোকজন আসতে লাগল। চলাচলের জন্যে পাস ইস্যুর প্রয়োজন ছিল। কবির কোনো এক প্রেস থেকে আমার নামে একটি প্যাড ছাপিয়ে আনল। সে প্যাডে বিভিন্ন নির্দেশ, পরামর্শ বা চলাচলের হুকুম দিতে শুরু করলাম। আসলে এভাবে একটা সিভিল প্রশাসন নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাডভোকেট আহমদ আলীকে সিভিল প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িত ছিলেন না বলে সশস্ত্র ব্যক্তিদের সামলিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাঁর জন্যে দুষ্কর হলো। তিনি আমাকে সাথে নিলেন। কুমিল্লাতে আমি খুব পরিচিত না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল। প্রশাসনের লোকেরা শ্রেণি নৈকট্যের কারণে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া পছন্দ করতেন। কয়েকদিনের মধ্যে জেলা প্রশাসনের সব ধরনের কর্মচারীদের এক সভায় আমি ও আহমদ আলী সাহেব ভাষণ দিলাম। আমাদের মতো করে স্বাধীন দেশে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব কী তা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখলাম। বিস্তারিত দায়দায়িত্ব তখন সবাইকে বুঝাতে পারিনি বলে সেদিন থেকে তাদের কাছ থেকে অনবরত টেলিফোন কল পেতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে আকবর-কবিরদের বাসাটি প্রশাসনিক সদর দফতরে পরিণত হলো।

সাত ডিসেম্বর ইয়াহিয়া নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের সাধের পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব জনমত অনুকূলে নেবার প্রয়াসে তারা ঢাকার ইসলামিয়া এতিমখানায় বোমাবাজি করে কয়েকশো এতিম শিশু হত্যা করে।

সাত ডিসেম্বর যশোর ও আট ডিসেম্বর কুমিল্লার পতন ঘটে। কুমিল্লায় পাকিস্তান বাহিনী সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান নেয়। ছয় তারিখে ভারত বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় এবং ভুটানও সে পথ অনুসরণ করে। নয় আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহরের মুখ ভারত মহাদেশের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের বাহানায় বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের ইচ্ছে প্রকাশ করে। পাকিস্তানিদের মনোবল রক্ষার আর এক উপায় হিসেবে উত্তর থেকে চীন এবং দক্ষিণ থেকে সপ্তম নৌবহরের অগ্রযাত্রার কথা শুনতে থাকি। তবে স্থল যুদ্ধে পাকিস্তান কোথাও দাঁড়াতে পারছিল না।

যশোর পতনের পরই সিলেটে যৌথবাহিনীর যোদ্ধারা হেলিকপ্টার থেকে অবতরণ শুরু করে। যশোর পতনের পরই লে. জে. নিয়াজি বুঝে নেয় যে পতন আসন্ন। সে কারণে গভর্নর মালেকের মাধ্যমে সে বিদেশি সাহায্য ও পরামর্শ চেয়ে পাঠায়। ১০ই ডিসেম্বর চাঁদপুর ও দাউদকান্দির পতন ঘটে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে সরে পাকিস্তান আর্মি ঢাকামুখী হতে শুরু করে। কিন্তু তারা যেন ঢাকায় গেড়ে না বসতে পারে এজন্য যৌথবাহিনী বিমান আক্রমণ দ্বারা নিয়াজিকে অস্থির করে তুলে। হঠাৎ করে নিয়াজি নিখোঁজ হয়ে যায়। তবে ১০ তারিখে তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দেখা যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইতোমধ্যে এন্টারপ্রাইজ নামক নৌবহর মোকাবিলা করতে সোভিয়েত নৌবাহিনী ও ভারতীয় নৌবাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে।

পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার দিকে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চট্টগ্রাম ও খুলনার দিকে আগাতে চায়, যা যৌথবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী প্রতিহত করে। মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ না হয়ে নিয়াজি আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে। তবে কোনোভাবে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৩ই ডিসেম্বর জেনারেল শ্যাম মানেক শয়ের নামে ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অস্ত্র সমর্পণের আবেদন জানানো হয় ও আত্মসমর্পণকারীদের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়।

১৪ই ডিসেম্বর থেকে ব্যাপক হারে রাজাকার-আলবদর ও আলশামসরা বুদ্ধিজীবী হত্যা কর্ম চালাতে থাকে। ঐ দিনই বঙ্গভবনে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্যে সমবেত করা হবে জেনে ভারতীয় বিমানবাহিনী বঙ্গভবন ও কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় বিমান আক্রমণ চালায়। গভর্নর মানেক পদত্যাগ করে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত ও হতভম্ব নিয়াজি মার্কিন দূতাবাসে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ সফল করার প্রস্তাব দেয়। ১৪ তারিখে বলতে গেলে কতিপয় সেনানিবাস ও মিরপুর ছাড়া সারা বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যায়। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। তখনও মোশতাক গং পাকিস্তান রক্ষায় শেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অতিশয় ন্যক্কারজনক শর্তাবলি সংবলিত আত্মসমর্পণ দলিল পাকিস্তান অনুমোদন দিলে ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে আত্মসমর্পণের

দলিল স্বাক্ষরিত হয়। কলকাতায় খোঁজাখুঁজি করে গ্রুপ-ক্যাপ্টেন খোন্দকারকে পাওয়া গেলে তিনি জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাথে ঢাকামুখী বিমানে সওয়ার হন। ৯৩০০০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রায় সকলেই যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করে। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত হলেও বিজয়টা পূর্ণতা লাভ করল না আমরা প্রতীক্ষায় ছিলাম কবে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন, কবে বঙ্গমাতাসহ শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও শেখ রাসেল বন্দিদশা থেকে উদ্ধার হবে, আর কবে মিরপুরের বিহারিরা আত্মসমর্পণ করবে।

এই পুরো সময়টায় আমি কুমিল্লাতেই ছিলাম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু– স্লোগানে মুখরিত সারা দেশে এক ধরনের স্বস্তিবোধ আসে। তারপরও আমরা মিরপুর নিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে উৎকণ্ঠিত জীবন কাটাতে থাকি। বঙ্গবন্ধু পরিবার নিয়েও আমাদের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। ১৭ই আগস্ট মেজর তারার নেতৃত্বে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব তাদের অবরোধ থেকে নিষ্কৃতি পান। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পরই আমরা বিজয়ের আসল স্বাদটি অনুভব করি।

জেনারেল ওসমানী ও পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ

আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের কিছু আগে ওসমানী হেলিকপ্টারে চড়ে বসেছিলেন। তাঁর সাথে শেখ কামাল ছিলেন। শেখ কামাল ছিলেন তাঁর এ ডি সি। আমার সাথে জেনারেল ওসমানীর তেমন কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। যুদ্ধের সময়ে কালে-ভদ্রে তাঁর সাথে দেখা হলেও আমাকে চিনে রাখা বা মনে রাখার মতো পরিচয় ছিল না। তবে কামালের সাথে আমার শুধু পরিচয় নয়, ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি কামালের কাছে ছিলাম তাঁর মান্নান ভাই।

কুমিল্লা সার্কিট হাউসে ১৬ই ডিসেম্বর দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত এক মহাসমাবেশ দেখেছি। বাঘা বাঘা যোদ্ধারা সেখানে আসছেন। সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি গেরিলা যোদ্ধা এবং বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জেনেই আমাকে সার্কিট হাউসে আসতে দেওয়া হলো। আত্মসমর্পণের দিন আমি দেখলাম, সার্কিট হাউসের কাছাকাছি জায়গায় জেনারেল ওসমানী ও কামাল হেলিকপ্টার থেকে অবতরণ করলেন। তাঁরা এখানে বেশিক্ষণ ছিলেন না। কাছে গিয়ে আমি জেনারেল ওসমানীকে তাঁর বাহিনীর অনেক সদস্যের মতো 'চাচা' বলে সম্বোধন করলাম এবং তিনি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন কি না তা জানতে চাইলাম। তিনি এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি জবাব দেননি বরং দ্রুত হেলিকপ্টারে উঠে যান। সেদিন থেকে অনেকের ন্যায় আমিও একটি খুঁতখুঁতানি নিয়ে ছিলাম।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে দীর্ঘদিন সদস্য ছিলাম। সে সিনেটে কার্যবিবরণী এখনও সহজ প্রাপ্য। জেনারেল ওসমানী কেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে এলেন না– সে প্রসঙ্গটি একবার উত্থাপিত হলে আমি আলোচনায় অংশ নেই। আমার বক্তব্যটি তুলে ধরার আগে যৌথ কমান্ড গঠনের শানে-নুজুল তুলে ধরছি। মুক্তিযুদ্ধে প্রথম থেকেই ভারতীয় বাহিনী আমাদের বাংলাদেশের সবকটি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছিল। কৌশলগত কারণে তা সোচ্চার প্রকাশের সুযোগ ছিল না। মুজিব বাহিনীর যোদ্ধারা ভিয়েতনামের মতো আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশ স্বাধীন করার প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু দিনে দিনে অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। পাকিস্তানিদের চাপ হোক, অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ কিংবা কূটকৌশলে মুক্তিযোদ্ধারাসহ গণপ্রতিনিধিদের যুদ্ধের পক্ষে পরিবর্তনের একটা প্রবণতা রক্ষিত হলো। ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে যোদ্ধাদের সুদৃঢ় ঐক্যে কিছুটা হলেও ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিল। সাথে ছিল মোশতাক ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পাকিস্তানের সাথে একটি সমঝোতার উদগ্র কামনা ও প্রয়াস।

শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সংকট প্রবল হয়ে উঠেছিল। অসুখবিসুখও ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি, রোগ শোকে, অনাহারে, অর্ধাহারে সংকট দিনে দিনে প্রবলতর হচ্ছিল। শিবিরগুলোতে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেওয়া হচ্ছিল, যোদ্ধাদের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানি প্রকট হচ্ছিল। মনোবল ভেঙে তাঁরা ধৈর্যহারা হয়ে উঠছিল এবং ভারতের হস্তক্ষেপের দাবি বেশি বেশি উঠেছিল। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া ও ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের দাবিও সোচ্চার হচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনকশার আভাস মিলছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষত আমাদের অধৈর্যশীলতার কথা জেনেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব ভিয়েতনাম কায়দায় দেশ স্বাধীনের ভাবনা ছেড়ে ভারতের সাথে যৌথ প্রয়াসে দেশ স্বাধীনে উদগ্রীব হয়ে উঠেন। যৌথবাহিনী গঠিত হলে উভয় পক্ষের দু'সেনাপতির পদমর্যাদা এক হতে হয়। তাই আগে থেকেই কর্নেল ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। ভারতের পুরো বাহিনীর সাথে আমাদের যৌথ কমান্ড গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল ওসমানীর সমকক্ষ অর্থাৎ কাউন্টার পার্ট ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর শ্যাম মানেকশ। প্রটোকল অনুসারে শ্যামের সাথে ওসমানী বসতে পারেন কিন্তু জগজিৎ সিং অরোরার উপস্থিতিতে কেবল মাত্র আমাদের উপ-প্রধান এ কে খোন্দকারই বসতে পারেন। ওসমানীর উপস্থিতিটা হতো আমাদের জন্য চরম অবমাননাকর ও সামরিক প্রটোকল বহির্ভূত। তাই উপ-প্রধানের সাথে উপ-প্রধানের সমতা বিধানের জন্যই ওসমানী সাহেব পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, ছিলেন খোন্দকার সাহেব। আমার এই ব্যাখ্যাটি বিনা বাক্য ব্যয়ে সিনেট অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল। আমি দিন–তারিখটি বলতে পারব না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনের কার্যবিবরণী অনুসন্ধানে তা পাওয়া যাবে। আমি এই ব্যাখ্যাটি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের কাছে একাধিকবার দিয়েছি এবং সবাই আমার ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন বলে আমার মনে হয়েছিল।

জেনারেল ওসমানীর কাছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের চেষ্টা যে একেবারে হয়নি তা নয়। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পাকিস্তানিদের চরম অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিল বলে পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিবাহিনী অপেক্ষা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত ছিল। তদুপরি জগজিৎ সিং অরোরা ও জেনারেল নিয়াজি ছিল কোর্সমেট এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টি নিরাপত্তা ও অহমবোধ বাঁচিয়ে রাখতে অরোরার কাছে নিয়াজি আত্মসমর্পণে রাজি হলো। বাংলাদেশ বাহিনীর জেনেভা কনভেনশনে কোনো পক্ষ ছিল না। পাকিস্তানিরা জানত যে, বাংলাদেশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। যৌথবাহিনী চাচ্ছিল যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি কেননা তখন সপ্তম নৌবহর আসে আসে অবস্থা। তাই অনেকটা পাকিস্তানিদের চাপে পড়েই অরোরার কাছেই আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা পাকা হয় এবং পাকিস্তানি পক্ষে নিয়াজি স্বাক্ষর দান করেন।

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী: বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেরাদুনে গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একমাত্র সশস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর উপাচার্য, স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পরিষদের সভাপতি, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী

বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

ইরিনা বাকোভা, বুলগেরিয়ার বর্ষীয়ান কূটনীতিক এবং ইউনেসকোর সাবেক মহাপরিচালক, তাঁর সঙ্গে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জার্মানির বার্লিনে 'বার্লিন ইকোনমিক ফোরাম ২০১৮' (মার্চ ৯-১১ই, ২০১৮)-এ অংশগ্রহণকালে মধ্যাহ্নভোজের সময় একান্ত আলাপের আমার সুযোগ হয়েছিল। বাকোভা তার কিছুদিন আগে ইউনেসকোর শীর্ষ পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর হাতে তাঁর সময়েই ২০১৭ সালে ইউনেসকো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে Memory of the World Register-এ অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ মর্যাদা, সম্মান ও স্বীকৃতি দান করে। এজন্যে ইউনেসকো এবং বাকোভাকে বাংলাদেশের তরফ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একান্তে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম কোন সুদৃষ্টি, বিবেচনা ও মানদণ্ডে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে এমন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন তাঁরা। বিচক্ষণ কূটনীতিক বাকোভা বাংলাদেশ সরকার, জনগণ এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর কিছু স্মৃতি তুলে ধরেন। তারপর বলেন, তিনটি প্রধান কারণ বা যুক্তি ইউনেসকোকে এই মূল্যবান ভাষণটিকে চির স্মর্তব্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল– প্রথমত. এটি ছিল একটি অলিখিত অথচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত অভিভাষণ যা দুর্লভ, দ্বিতীয়ত. বক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর জনগণকে তাদেরই বাক্‌প্রতিমায়, ভাষার কারুকার্যে ও অভিব্যক্তিতে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তৃতীয়ত. সেই অভিভূত জনগণই তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই নির্দেশনা মতো স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অকাতরে জীবন দিতে পেরেছিল এবং স্বাধীনতা অর্জন ও শেখ মুজিবকে তাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। বাকোভা যা আমাকে বলেছিলেন, ইউনেসকোর স্বীকৃতি স্মারকে সেটিই প্রতিফলিত–

> The speech effectively declared the independence of Bangladesh. The speech constitutes a faithful documentation of how the failure of post-colonial nation-states to develop inclusive, democratic society alienates their population belonging to different ethnic, cultural, linguistic or religious groups. The speech was extempore and there was no written script. However, the speech survived in the audio as well as AV versions.

ইউনেসকোর এই মূল্যায়ন প্রত্যয়নের মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল প্রেরণা, দর্শনের অবয়ব। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ), সকল ধর্ম-মত সংস্কৃতিতে সুশোভিত জনগণকে গণতান্ত্রিক সমাজের ভাববন্ধনে আবদ্ধ করার দর্শন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে চালিকাশক্তি হিসেবে ফুটে উঠেছিল। সেটিই বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনের মর্মবাণী। সেই দর্শনে অভিসারী হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজ উপনীত বিশ্বময় নন্দিত উন্নয়নের বিস্ময়-উদ্রেককারী দেশ হিসেবে।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম ১০০ দিনে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন ও ইতিহাসের অন্যতম মানবিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত সমাজকে পুনর্বাসনে যে সমস্ত কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার কিছু তালিকায় তাকালে বোঝা যাবে, বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনকে তিনি কীভাবে বাস্তবায়নাভিমুখী করতে চেয়েছিলেন–

১) কৃষিজমির খাজনা ১৯৭২-এর ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত বকেয়া সুদসমেত (১৩ই জানুয়ারি) মওকুফ।

২) সরকারের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ঘোষণা (১৪ই জানুয়ারি)

৩) পৌরসভা ও শহর কমিটির অধীন সমস্ত বাড়ির বকেয়া কর ও ৩১শে মার্চ পর্যন্ত দেয় পাওনা মওকুফ (১৭ই জানুয়ারি)

৪) গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ বন্ধকরণ (১৯শে জানুয়ারি)

৫) পাট রপ্তানির ওপর শুল্ক আরোপ। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল গঠিত (২৫শে জানুয়ারি)

৬) সরকারি অফিসে ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিলাসদ্রব্য ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞার প্রজ্ঞাপন (২রা ফেব্রুয়ারি)

৭) সরকারি নিয়ন্ত্রণে ৩৯২টি শিল্পের দায়িত্ব গ্রহণ (৫ই ফেব্রুয়ারি)

৮) চলতি বছরের লবণ শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত (১৪ই ফ্রেব্রুয়ারি)

৯) পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধার আদেশ জারি (১৮ই ফেব্রুয়ারি)

১০) একশো বিঘার বেশি জমি কোনো পরিবারে না রাখতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত (২০শে ফেব্রুয়ারি)

১১) বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল আদেশ ১৯৭২: বাংলাদেশের হাইকোর্টের বিচারপতিগণের চাকরি

শর্তাবলি বিধি এবং বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারী (অবসর) আদেশ ১৯৭২ জারি (২৮শে ফেব্রুয়ারি)

১২) নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত ইজারা বা তোলা আদায় নিষিদ্ধ (১১ই মার্চ)

১৩) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (২৩শে মার্চ)

১৪) ব্যাংক বীমা, বস্ত্র, চিনি কল, পাটশিল্প ইত্যাদি (শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ) আদেশ জারি (২৬শে মার্চ)

১৫) স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আমদানি নীতি ঘোষণা (২৪শে এপ্রিল)

[এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার : ১৯৭১-৭৫*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ. ৩১০-৩১২]

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে-কোনো যৌথ সংসারে কিংবা কারবারে সকলের আয় উন্নতির সমান সুযোগ নিশ্চিত না হলে, ন্যায়নীতিনির্ভর কর্তব্য পালনে দৃঢ়চিত্ত প্রত্যয় না থাকলে, সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের সমান সুযোগ না থাকলে, অনেককেই পেছনে ফেলা হবে। যে-কোনো উন্নয়ন উদ্দেশ্য অর্জন তথা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রয়াসে সকলের সমর্পিতচিত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আস্থা যেমন জরুরি, জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াস প্রচেষ্টাতেও সমন্বিত উদ্যোগের আবশ্যকতাও একইভাবে অনস্বীকার্য। জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগে থাকা চাই প্রতিটি নাগরিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবদান। অপচয়-অপব্যয় রোধ, লাগসই প্রযুক্তি ও কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা সীমিত সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সকলের মধ্যে অভ্যাস, আগ্রহ ও একাগ্রতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠা দরকার। নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও উপলব্ধির জাগৃতিতে অনিবার্য হয়ে ওঠে যে নিষ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষা, তা অর্জনের জন্য সাধনার প্রয়োজন, প্রয়োজন ত্যাগ স্বীকারের। দায়দায়িত্ব পালন ছাড়া স্বাধীনতার সুফল ভোগের দাবিদার হওয়া বাতুলতা মাত্র। 'ফেলো কড়ি মাখ তেল'– কথাটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এজন্যে যে, উৎপাদনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেই ফসলের ন্যায্য অধিকার প্রত্যাশী হওয়া স্বাভাবিক এবং সংগত কর্ম ও ধর্ম নয়।

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীলে উত্তরণে বাংলাদেশের যোগ্যতা অর্জনের ঘোষণা এসেছিল জাতিসংঘের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) থেকে। শর্ত হিসেবে তিনটি সূচকেই নির্ধারিত মান অর্জন করতে হবে বাংলাদেশকে। এই উন্নতির ধারাবাহিকতা তিন বছর বজায় রাখতে পারায় সম্প্রতি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ইকোসোক) স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা উত্তরণের সুপারিশ করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য আরও তিন বছর যোগ দুই (করোনার কারণে বাড়ানো) বছর অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বাংলাদেশকে। এরপরই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জাতিসংঘের তালিকায় পাকাপোক্তভাবে থাকা হবে। প্রথমবারের মতো উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করার খবরটি বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই ইতিবাচক। ১৯৭৬ সালে এলডিসিভুক্ত হওয়ার পর এই প্রথম অর্থনৈতিক উন্নতির বড়ো ধরনের স্বীকৃতি মিলবে, প্রসঙ্গত যে, এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তালিকায় নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছিল বাংলাদেশ। এর ফলে আগামী ছয় বছরে বাজার সুবিধায় তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। ২০২৭ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা থাকবে। ওষুধ শিল্পের মেধাস্বত্ব সুবিধা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত থাকবে।

অনেকে মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশ হলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের বাজার সুবিধা সংকুচিত হতে পারে। দাতাদের কাছ থেকে কম সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগও কমে যাবে। তাই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ বৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগী হতে হবে। আবার অভ্যন্তরীণ বাজার চাঙা করতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের আয় বাড়াতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কাটাতে হবে অবকাঠামো দুর্বলতা। জোর দিতে হবে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরিতে। দাতাদের কাছ থেকে যেহেতু রেয়াতি সুদে ঋণ প্রাপ্তি কমে যাবে, তাই বিকল্প অর্থায়নের দিকেও জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কর আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। যেসব দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে, তাদের বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও দায়িত্ব ও সম্ভাবনা বেড়ে গেল। বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতি ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই।

শোষণ, বঞ্চনা আর বণ্টন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার বাঙালির ঐতিহাসিক মুক্তির সংগ্রামের প্রকৃত অর্জন বা বিজয় বিবেচনার জন্য বিগত পাঁচ দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিবেশ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই স্বীকৃতি বা অর্জন একটি প্রত্যয় ও প্রতীতি জাগাতে পারে। প্রথমেই আসে সমন্বিত উদ্যোগের প্রেরণার প্রসঙ্গ, যেমনটি মতবাদ হিসেবে কর্পোরেট কালচার আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিবেচনা ও ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশীদারিত্ব হিসেবে শ্রমের মূল্যায়ন সরাসরি স্বীকৃত না হলেও এটি অনিবার্য উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে যে, কোনো উৎপাদন ও উন্নয়ন উদ্যোগে ভূমি, শ্রম ও পুঁজি ছাড়াও মালিক-শ্রমিক সকল পক্ষের সমন্বিত ও পরিশীলিত প্রয়াস প্রচেষ্টাই সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বারা দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়াও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়াসকে সমাজবিজ্ঞানীরা জাতিগত উন্নয়নে প্রেরণা হিসেবে শনাক্ত করেন। স্থান-কাল-পাত্রের পর্যায় ও অবস্থান ভেদে উন্নয়ন ও উৎপাদনে সকলকে একাত্মবোধের মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার প্রেরণা হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে গোটা দেশবাসীকে ভাববন্ধনে আবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। কারো কারো অধিক বড়ো হওয়া আর অনেকের পিছিয়ে পড়ার পরিবেশে পরিসংখ্যানগত প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে বৈষম্যবিহীন উন্নয়ন নিশ্চিত হওয়া উপাদেয় হবে।

'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। মানুষই বড়ো কথা। করোনায় মানুষ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ এই মানুষের দায়িত্ববোধের দ্বারা কর্তব্য কর্ম সুচারুরূপে সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজ সমৃদ্ধি লাভ করে। আবার এই মানুষের দায়িত্বহীনতার কারণে সমাজের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। মানবসম্পদ না হয়ে সমস্যায় পরিণত হলে সমাজের অগ্রগতি তো দূরের কথা সমাজ মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি সভ্যতার বিবর্তনে সহায়ক হয়। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ কিংবা মারণাস্ত্রে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানবতার জয়গান মানুষই রচনা করে আবার মানব ভাগ্যে যত দুর্গতি তার স্রষ্টাও সে। মানুষের সৃজনশীলতা, তার সৌন্দর্যজ্ঞান, পরস্পরকে সম্মান ও সমীহ করার আদর্শ অবলম্বন করে সমাজ এগিয়ে চলে। পরমত সহিষ্ণুতা আর অন্যের অধিকার ও দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাধ্যমে সমাজে বসবাস করার পরিবেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য ব্যাংকের উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

সৃষ্টি হয়। সুতরাং সকলের সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগে সমাজ নিরাপদ বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই মানুষের সার্বিক উন্নয়নকে দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করে থাকেন। সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণ সৃষ্টিতে মানুষের সার্বিক উন্নতি অপরিহার্য শর্ত। আগে সমাজ না আগে মানুষ– এ বিতর্ক সর্বজনীন। মানুষ ছাড়া মনুষ্য সমাজের প্রত্যাশা বাতুলতামাত্র। সুতরাং একেকটি মানুষের উন্নতি সকলের উন্নতি, সমাজের উন্নতি। একেক মানুষের দায়িত্ববোধ, তার কাণ্ডজ্ঞান, তার বৈধ-অবৈধতার উপলব্ধি এবং ভালোমন্দ সীমা মেনে চলার চেষ্টা প্রচেষ্টার মধ্যে পরিশীলিত পরিবেশ গড়ে ওঠা নির্ভর করে। রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারিত আছে। কিন্তু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা অধিকার আদায়ের সম্ভাবনা ও সুযোগকে নাকচ করে দেয়। পণ্য ও সেবা সৃষ্টি না হলে চাহিদা অনুযায়ী ভোগের জন্য সম্পদ সরবরাহে ঘাটতি পড়ে। মূল্যস্ফীতি ঘটে, সম্পদ প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বাড়ে। পণ্য ও সেবা সৃষ্টি করে যে মানুষ, সেই মানুষই ভোক্তার চাহিদা সৃষ্টি করে। উৎপাদনে আত্মনিয়োগের খবর নেই– চাহিদার ক্ষেত্রে ষোলোআনা টানাপড়েন তো সৃষ্টি হবেই। অবস্থা ও সাধ্য অনুযায়ী উৎপাদনে একেকজনের দায়িত্ব ও চাহিদার সীমারেখা বেঁধে দেওয়া আছে কিন্তু এ সীমা অতিক্রম করলে টানাপড়েন সৃষ্টি হবেই। ওভারটেক করার যে পরিণাম হয় দ্রুতগামী বাহনের ক্ষেত্রে, সমাজে সম্পদ অর্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রমণে একই পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমাজে অস্থিরতা ও নাশকতার যতগুলো কারণ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এই অবৈধ সম্পদ অর্জন, অধিকার বর্জন এবং আত্মত্যাগ স্বীকারে অস্বীকৃতি মুখ্য।

অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন ব্যতিরেকে স্বাধীনতা যে নির্মল নয়– একুশ শতকের এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে তা বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। ইতোমধ্যে একথা বহুল উচ্চারিত হয়ে আছে যে, একুশ শতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নই হবে তাবৎ রাষ্ট্র ও জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অন্যতম নিয়ামক। আর সে কারণে অন্যান্য অনুষঙ্গের চাইতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রসঙ্গকে এগিয়ে আনা হচ্ছে উন্নয়ন কৌশলের সকল পরিকল্পনা পত্রে।

বিশ্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল এশিয়ায়। সামরিক শক্তিমত্তার পাশাপাশি দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার অবদান সেখানে ছিল। পরবর্তীতে ইউরোপে প্রসার ঘটে এশীয় সমৃদ্ধি ও জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যয়ন অনুধাবনের। একে অবলম্বন করেই ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বিশ্ব নেতৃত্ব ইউরোপের হাতে চলে যায়। এরপর ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ঢেউ আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকার উপকূলে আছড়িয়ে পড়ে। বিগত শতাব্দীতেই আমেরিকা শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে প্রযুক্তির উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক শক্তিতে উন্নীত হয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক তথা বিশ্ব রাজনৈতিক পরাশক্তির পরিচিতিতে পৌঁছে দেয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান-উত্তর পরিবেশে এখন তার শক্তিশালী অবস্থান মূলত অর্থনৈতিক শক্তিমত্তার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার উপরই নির্ভর করছে। জাপানসহ পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে বিগত কয়েক দশকে অর্জিত অর্থনৈতিক সাফল্যও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, একুশ শতকে এশিয়া আবার ফিরে পেতে পারে তার গৌরব। ইনফরমেশন টেকনলজির উৎকর্ষতাই হবে অর্থনৈতিক সাফল্যের সোপান, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ব রাজনীতিকে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা জীবনযাত্রার মানকে, মূল্যবোধকে এমন একটি প্রত্যয় প্রদান করে যা অন্যান্য সকল অনুষঙ্গ অনুশাসনে বা সুনীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়। ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে যে কথা, সে কথা রাষ্ট্র বা দেশের ক্ষেত্রেও। সাম্প্রতিককালে বিশ্বে যতগুলো জাতীয় স্বাধীনতা বা মুক্তিসংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর মূল প্রেরণায় ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা তথা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বলয় থেকে রাষ্ট্রীয় সৌভাগ্য ও সুযোগকে

সকলের আয়ত্তে বা অধিকারে আনা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, উন্নত অবকাঠামো এবং মানবাধিকারসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের বিষয়গুলোকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে শুধু দাবিই করা হচ্ছে না বরং এসবের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির সূচকই এখন সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের প্রতি জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিচায়ক।

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে অধিকতর উদারীকরণের লক্ষ্যে দেশে দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের যে কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে তার অভীষ্টই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় তথা বৈশ্বিক সম্পদ ও সুযোগে সকলের অবারিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। স্বচ্ছতা ও সুশাসনের তাগিদ এইসব সংস্কার ব্যবস্থাপত্রে প্রকৃতপক্ষে আমজনতার ক্ষমতায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত এ সংস্কার ক্রমান্বয়ে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের অন্যান্য রীতি-পদ্ধতির (যেমন ইমিগ্রেশন, ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট ইত্যাদি) ওপর প্রভাব ফেলবে– এ কথা বলাই বাহুল্য। পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে কিছুকাল আগে থেকে পরিলক্ষিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসব দেশগুলোর নেতৃত্বকে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশকে যেভাবে স্পর্শ করেছে তাতে এটা স্পষ্টতর হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশাসন-জবাবদিহি-স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত না হলে সেখানে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি টেকসই হতে পারবে না।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনাকে করপোরেট সংস্কৃতি সম্ভাবনার বলয়ে নিয়ে যাওয়ার যে চিন্তা-চেতনা তা মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রযুক্ততার বোধবুদ্ধি ও উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ, তা তো সকলকে এক ছাতার তলায় শামিলকরণের ধারণার ও প্রয়াসেরই প্রতিবিম্ব। ফাইনানশিয়াল ইনকুলুশান-এর উদ্দেশ্য তো তাই। বিদেশি শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা অর্থবহ হবে না যদি নিজের স্বনির্ভরতা বা স্বয়ম্ভরতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন স্বার্থ রক্ষার বেদীমূলে নিবেদিত হয়। একটি শুদ্ধ সংগীত সৃষ্টিতে সুরকার, গায়ক, গীতিকার ও বাদ্যযন্ত্রীর সমন্বিত প্রয়াস যেমন অপরিহার্য তেমনি দেশ বা সংসারের সামষ্টিক অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সকল পক্ষের সহযোগিতা ছাড়া সুচারুরূপে সম্পাদন সম্ভব নয়।

একটি কল্যাণ অর্থনীতিতে সকল পক্ষকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন এবং সকল প্রয়াস প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে অয়োময় প্রত্যয়দীপ্ত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। একজন কর্মচারীর পারিতোষিক তার সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বা পারদর্শিতা অনুযায়ী না হয়ে কিংবা কাজের সফলতা-ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব বিবেচনায় না এনে যদি দিতে হয় অর্থাৎ কাজ না করেও সে যদি বেতন পেতে পারে, কিংবা তাকে বেতন দেওয়া হয়, তাহলে দক্ষতা অর্জনের প্রত্যাশা আর দায়িত্ববোধের বিকাশভাবনা মাঠে মারা যাবেই। এ ধরনের ব্যর্থতার বজরা ভারী হতে থাকলেই যে-কোনো উৎপাদন ব্যবস্থা কিংবা উন্নয়ন প্রয়াস ভরতুকির পরাশ্রয়ে যেতে বাধ্য। দারিদ্র পীড়িত জনবহুল কোনো দেশে পাবলিক সেক্টর বেকার ও অকর্মণ্যদের জন্য যদি অভয়ারণ্য কিংবা কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করে তাহলে সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। যদি বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে পরিণত করা না যায়, উপযুক্ত কর্মক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা না হয়, তাহলে উন্নয়ন কর্মসূচিতে বড়ো বড়ো বিনিয়োগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। চাকরিকে সোনার হরিণ বানানোর কারণে সে চাকরি পাওয়া এবং রাখার জন্য অস্বাভাবিক দেনদরবার চলাই স্বাভাবিক। দায় দায়িত্বহীন চাকরি পাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকার ফলে নিজ উদ্যোগে স্বনির্ভর হওয়ার আগ্রহতেও অনীহা চলে আসে। মানবসম্পদ অপচয়ের চেয়ে বড়ো নজির আর হতে পারে না। দরিদ্রতম পরিবেশে যেখানে শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের কঠোর পরিশ্রম, কৃচ্ছতা সাধন ও আত্মত্যাগ আবশ্যক সেখানে সহজে ও বিনা ক্লেশে কীভাবে অর্থ উপার্জন সম্ভব সেদিকেই ঝোঁক বেশি হওয়াটা সুস্থতার লক্ষণ নয়।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সাবেক সচিব এবং এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান, mazid.muhammad@gmail.com

বঙ্গবন্ধুর ওপর তুর্কি ভাষায় প্রামাণ্যচিত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের ফ্রেন্ডশিপ হলে ১৮ই নভেম্বর কনস্যুলেটের উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় এবং শাকিল রেজা ইফতির পরিচালনায় নির্মিত *তুর্কিয়ে বঙ্গবন্ধু'য়ু আনিওর* (তুরস্কে বঙ্গবন্ধু) শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রামাণ্যচিত্রে তুর্কি ভাষায় তুরস্কের ইতিহাসবিদ আজমি ওজ্জকান, ইকোনমিক জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান জেলাল তোপরাক, লেখক ও সংগীতশিল্পী হাকান মেনগুছ, দক্ষিণ-এশিয়া বিষয়ক গবেষক মিজ এলিফ বালি, সাংবাদিক আহমেত জোশকুনায়দিনসহ ১২ জন বিশিষ্ট তুর্কি নাগরিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের সম্পর্ক শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে নিয়ে তুর্কি ভাষায় সর্বপ্রথম নির্মিত এই প্রামাণ্যচিত্রে বিশিষ্ট তুর্কি নাগরিকদের আন্তরিক মন্তব্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মুজিববর্ষে তুরস্কের পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এর চেয়ে ভালো পন্থা আর হতে পারে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় নেতৃত্ব এবং তাঁর জীবন ও দর্শন সম্পর্কে তুর্কিদের বিস্তৃত পরিসরে অবহিত করার মাধ্যমে এই প্রামাণ্যচিত্র দুদেশের জনগণের বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, আজকের এই মুহূর্তটি বাংলাদেশ-তুরস্কের জনগণ ও দুদেশের সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রথমবারের মতো তুর্কি ভাষায় নির্মিত এ প্রামাণ্যচিত্রটি দুদেশের জনগণের মধ্যকার বিরাজমান ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

প্রতিবেদন: ইশরাত হক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮শে নভেম্বর বঙ্গভবনে দরবার হলে 'চিরঞ্জীব মুজিব' বিষয়ক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উপভোগ করেন– পিআইডি

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুজিব-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি

জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ

গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'শোনো, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি' গানটি লিখেছিলেন, আর ঐদিনই সুর করেছিলেন অংশুমান রায়। যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বজ্রকণ্ঠ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পরপরই এই গানটি বাজানো হতো। তখন বাঙালির দেহের রক্ত টগবগ করে উঠত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যেকের রক্তে গানের ছন্দে ছন্দে জোয়ার জাগত, তাঁরা গানের ঝংকার ও তালে তালে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এভাবেই এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুজিবের জন্ম হয়েছিল বাঙালি মানসে। আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জনের বহুদিন বহুবছর পরও বিস্ময়ের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্রে ক্রমবর্ধমান মুজিব-প্রভাব লক্ষ করি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

চলচ্চিত্র আধুনিক বিশ্বে শিক্ষাবিস্তার, জাতি গঠন ও সুন্দর সমাজ নির্মাণের শক্তিশালী হাতিয়ার। রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক স্মৃতি ধরে রাখার অপরিমেয় শক্তির কথা জানতেন। তাই তিনি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনে সবসময়ই চলচ্চিত্রকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলতেন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতিরূপ নির্মাণই সার্বিকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মুখ্য কাজ। গণমানুষের জীবনের সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি এই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের কারণেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতির কবি ও চলচ্চিত্রবান্ধব এক পরিপূর্ণ ও আধুনিক রাষ্ট্রনেতা।

পাকিস্তান আমলে ঔপনিবেশিক শাসকরা বাঙালির সদর্থক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করত। প্রচারমাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের সিদ্ধান্ত তাদের এমনই এক হীন মানসিকতার পরিচয়। কিন্তু বাঙালি জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসকদের এই হীন ষড়যন্ত্র মেনে নেয়নি, মানেননি বঙ্গবন্ধুও। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে পরদিন সোহরাওয়ার্দী ময়দানে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেকসপিয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও সে তুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া (পাকিস্তান) সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হবেই।' এই আপোশহীন সংগ্রামী চরিত্রই বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক দর্শনে হিমালয়ের উচ্চতায় আসীন করেছে।

বঙ্গবন্ধু আজীবন শোষণমুক্ত, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক চিন্তা তাঁরই স্বপ্নের সমার্থক। বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরব। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা।'

বঙ্গবন্ধু মর্মে মর্মে রাজনীতিবিদ হয়েও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভাবলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন রাজনীতির কবি– Poet of Politics। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মধ্যবিত্তের শহুরে ভাষার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন লোকভাষা। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। পাকিস্তান আমলের আইনসভায়ও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পক্ষে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা।

স্বাধীনতার পর অতি অল্প সময়ে বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনা করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। আদালতের রায় বাংলা ভাষায় লেখার নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলতেন, 'সাহিত্যশিল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে এ দেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা। সাহিত্যশিল্পকে কাজে লাগাতে হবে তাদের কল্যাণে। ... আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা

উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। ... আমার আবেদন, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ না হয়ে থাকে, বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যেন তাতে প্রতিফলিত হয়।'

এরূপ বোধে জারিত হয়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদী ভাবাদর্শে প্রভাবিত নেতা বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বঞ্চিত মানুষের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এ দেশের চলচ্চিত্রের দর্শক, নির্মাতা ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্যই তিনি মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল 'দ্য ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বিল ১৯৫৭' পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইপিএফডিসি, যা আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের সার্বিক বিকাশে মৌলিক ও অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে গতি পায়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশে ১৪-১৫টি চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করা হয় বঙ্গবন্ধুর সময়কালে। এর মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশ সিনেমাটোগ্রাফ রুলস ১৯৭২; দ্য সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট ১৯৬৩।

আন্তর্জাতিকভাবে এ দেশের নির্মাতা-কলাকুশলীদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বাইরের চলচ্চিত্রকে এ দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে ঢাকায় পোল্যান্ড চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৭৪ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে বিদেশে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধিত্ব করে এবং পুরস্কার পায়। ১৯৭২ সালের তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* পুরস্কার পায়। এটি পরে সিডালক পুরস্কারও অর্জন করে। ১৯৭৩ সালে সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* মস্কো, ১৯৭৪ সালে খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* ও মিতার *আলোর মিছিল* তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫৪টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওপর সর্বাধিক ১৪টি ছবি তৈরি হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে আলমগীর কবির তৈরি করেন আরও চারটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: *পোগ্রম ইন বাংলাদেশ*, *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে*, *বাংলাদেশ ডায়েরি* এবং *টুওয়ার্ডস গোল্ডেন বাংলা*। বাণিজ্যিক ধারায় নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র– *ওরা এগারো জন* (১৯৭২), *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২), *জয়বাংলা* (১৯৭২), *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), *বাঘা বাঙালি* (১৯৭২), *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৩), *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), *আলোর মিছিল* (১৯৭৪), *সংগ্রাম* (১৯৭৪), *বাংলার ২৪ বছর* (১৯৭৪), *কার হাসি কে হাসে* (১৯৭৪) প্রভৃতি ছবি।

সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) থেকে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ আগমন, দিল্লি থেকে শুরু করে জাপান, রাশিয়া, মিসর, ইরাক ইত্যাদি সফর ও সরকারি কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রামাণ্যচিত্র। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *অসমাপ্ত মহাকাব্য*, *চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু*, *স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো* (৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অবলম্বনে), *বঙ্গবন্ধু ফরএভার ইন আওয়ার হার্টস*, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতি বিষয়ক তথ্যচিত্র), *আমাদের বঙ্গবন্ধু* (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র), *সোনালী দিনগুলো* (বঙ্গবন্ধু সরকারের সাড়ে তিন বছর), *ওদের ক্ষমা নেই* ও *হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু*। এছাড়া বিদেশিদের দ্বারা নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– *রহমান*, *দ্য ফাদার অব বেঙ্গল*, *বাংলাদেশ*, *ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ*, *দ্য স্পিচ*, *পলাশি থেকে ধানমন্ডি*, *বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ*।

বিএফডিসিতে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য

সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক শক্তির চক্রান্ত, এদেশীয় ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ এবং কিছুসংখ্যক বিপথগামী সামরিক কর্মকর্তার চক্রান্তে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ শাহাদতবরণ করেন। ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। পৃথিবীর নৃশংসতম বর্বরোচিত ও জঘন্য এ হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসঞ্জাত বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে নানা ধরনের অসহযোগিতা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

চলচ্চিত্র কর্মীদের সাথে বঙ্গবন্ধু

মূলধারায় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রুচিশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর অকাল প্রয়াণের ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পালটেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রেকর্ড পরিমাণ ছবি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক ছবি ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। এখন নতুন পরিচালকরা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করছেন। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও এর প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অনুদান ও মুজিব জন্মশতবর্ষ নিয়ে চলচ্চিত্র আহ্বান এ বিষয়ে নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে অনেক ধরনের কবিতা, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছেন। প্রয়াত হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহুভাবে, বহুবর্ণে লেখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দৈনন্দিন জীবন ও দার্শনিক চিন্তাসঞ্জাত অসংখ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যচিত্রও নির্মিত হয়েছে এবং এখন তা ক্রমবর্ধমান গতি পাচ্ছে।

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে *টুঙ্গিপাড়ার দুঃসাহসী খোকা* চলচ্চিত্র তৈরি করছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। সালমান হায়দারের শিশুতোষ চলচ্চিত্র *শেখ রাসেলের আর্তনাদ*ও নির্মাণাধীন রয়েছে। এখানেও বঙ্গবন্ধুর চরিত্রটি আছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে সোহেল রানা বয়াতি তৈরি করছেন *তর্জনী* চলচ্চিত্র। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা থেকে দাফন পর্যন্ত সময়টুকু উঠে আসবে *৫৭০* নামের এক অজানা গল্পের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এটি তৈরি করছেন আশরাফ শিশির। এছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের অন্ধকারতম ঘটনাটি নিয়ে তৈরি হয়েছে *আগস্ট ১৯৭৫*। পরিচালক সেলিম খান।

স্বাধীনতার পর অনেকবারই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নানা কারণে থেমে গেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করার পর এ দেশের সংস্কৃতি এবং আর্ট-কালচারের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বঙ্গবন্ধুর নামটাও রেডিও-টেলিভিশনে উচ্চারণ করা হতো না। জনগণ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, দেশে আরও বিপুল উদ্যমে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছোটোবড়ো সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টির মতো চলচ্চিত্র নির্মাণের এক মহাপরিকল্পনা রয়েছে এ বছর।

এবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র *বঙ্গবন্ধু* নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। তিনি ভারতের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক। বাংলা ভাষায় নির্মিত ছবিটি পরে ইংরেজি ও হিন্দিতে ডাব করা হবে। হিন্দিতে সাব-টাইটেলও থাকবে। বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক মানের হবে বলে সকলের আশা।

শুনেছি হলিউডেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ চলছে।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা, সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। বাঙালি জাতির ইতিহাস ও অস্তিত্বের সাথে মিশে আছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও জাজ্বল্যমান সূর্যের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন তিনি। মুজিব-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তাই অনিবার্যভাবেই উচ্চকিত হয়ে উঠছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে, অনাদিকাল ধরে বহমান থাকবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এই অবিনাশী ধারা।

জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ [ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন]: সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, কবি, লেখক, নির্মাতা ও গবেষক, jhm21bd@gmail.com

আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন

জাফর ওয়াজেদ

শিরোনামের অমোঘ ঐতিহাসিক ঘোষণাটি দিয়েছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বকণ্ঠে এই ঘোষণা প্রদানের পর দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' জনগণ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এই ঘোষণা প্রদানের একমাত্র অধিকার ছিল বঙ্গবন্ধুর, জাতি সত্তরের নির্বাচনে সেই ক্ষমতা প্রদান করেছিল তাঁকে। বাংলাদেশের জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ধারকে পরিণত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে। যে জাতীয় চেতনার উন্মেষের ফলে আমাদের সময়কালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে, সেই জাতি চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। পাকিস্তান নামক 'অদ্ভুতুড়ে' রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে তিনি তার জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সহস্র বছরের মধ্যে বাঙালির ঐ প্রথম গণজাগরণ ঘটেছিল একাত্তর সালে এসে।

এমনিতেই জন্মমুহূর্ত থেকেই পাকিস্তান ছিল এক সমস্যাসংকুল রাষ্ট্র। কারণ এর বাস্তবতা ও এর মানসিকতায় কোথাও মিল পাওয়া যায়নি। প্রকট হয়ে উঠেছিল দেশ শাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর শাসন ক্ষমতা মুসলিম লীগের পাকিস্তানপন্থিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। মুসলিম লীগের বাঙালিরা হয়ে পড়ে তাদের তল্পিবাহক। বাঙালি জাতি হয়ে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রজা। শোষণের ভারে জর্জরিত ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে দুটুকরো করার পর ভারত গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান হয়ে পড়ে গোলমেলে এক রাষ্ট্র। কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো না চালু। বিফলে গেল সংবিধান প্রণয়নের নানা প্রচেষ্টাও। বিরোধীপক্ষের কণ্ঠরোধ, যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজনও সম্পন্ন করা হয়নি। দেশভাগ-পূর্ববর্তী অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিতাড়িত জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়েছিল। দেশত্যাগে বাধ্য হয়ে প্রবাসে নির্বাসিত জীবনে মৃত্যুবরণ করেন বাঙালির প্রিয় নেতা গণতন্ত্রের মানসপুত্রখ্যাত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ততদিনে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে পূর্ববঙ্গকে নিষ্পেষণের নানা ফন্দিফিকির চালায়। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে শেখ মুজিবসহ আরও বাঙালি নেতার প্রতিবাদের মুখে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। আঘাত হানা শুরু হয় বাঙালির শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ওপর।

সোহরাওয়ার্দীর জীবনাবসানের পর তাঁর দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায় তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর। মওলানা ভাসানীসহ আরও কতিপয় ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা দলছুটরা গঠন করেছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয় বাস্তবতার নিরিখে, অসাম্প্রদায়িক চেতনার আলোকে। দলটি দ্রুত সক্ষম হয়ে ওঠে। সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব সাহসী ও অক্লান্তকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করে সারা দেশে সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সালে এরা সবাই জোটবদ্ধ হয়ে প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে লড়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রবীণ নেতা শেরে বাংলা। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট এবং মুসলিম লীগের ভাগ্যে জুটেছিল ধস নামানো পরাজয়। পূর্ব বাংলার বাঙালিরা মুছে দিয়েছিল মুসলিম লীগের অস্তিত্ব।

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে ১৭ দিনের সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হলে অসম্মানজনক তাসখন্দ যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে হয় জান্তাশাসক আইয়ুব খানকে। এই যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভারত চাইলে স্বল্প সময়ের মধ্যে দখল করে নিতে পারত বিনা প্রতিরোধে। যুদ্ধকালে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রতিরোধের জন্য মোতায়েন করা হয়নি সেনা। অবশ্য ভারত পূর্ববঙ্গে আক্রমণের চেয়ে পাকিস্তানে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে পর্যুদস্ত করেছিল পাকিস্তানি হানাদার সেনাদের। পাকিস্তানের এই পরাজয় বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করে। শেখ মুজিব এই বিষয়গুলো জনগণের সামনে নিয়ে আসেন। ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। সারা বাংলার মানুষ ক্রমান্বয়ে এই কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। কারণ পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলেছিল প্রতিবছর। সেই সঙ্গে ক্ষমতা ও ন্যায়ভিত্তিক সংস্কারের দাবি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা রাজনৈতিক মীমাংসার পথে না গিয়ে ছয় দফার দাবিদার শেখ মুজিবকে কার্যত আইনের অস্ত্রে ঘায়েল করতে চেয়েছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের দায়ে দায়ের করা কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিব হলেন প্রধান অভিযুক্ত।

বাংলার বাঙালি এটাকে দেখল মুজিবের বিরুদ্ধেই শুধু চক্রান্ত নয়, বাঙালি জাতিকে আরও নিষ্পেষিত, কণ্ঠরোধ করা, অধিকারহীন অবস্থানে নিয়ে যাওয়ারও ষড়যন্ত্র। ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হলো। তারা ছয় দফার আলোকে ঘোষণা করল এগারো দফা। গর্জে উঠল সারা বাংলা। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের গদি টলমল। সারা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে গণ-আন্দোলন। তার ঢেউ লাগে পাকিস্তানের সর্বত্রও। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য

হয় আইয়ুব সরকার ১০ বছর টানা শাসন শেষে। তবে উত্তরসূরি হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া শাসনভার গ্রহণের দুই বছরের মাথায় একাত্তরের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যা চালায়। ইয়াহিয়া ক্ষমতা নিয়ে বেতারে যে ভাষণ দেন, তাতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার ওপরেই জোর দেন। বিশেষভাবে জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা। বাঙালি বুঝে নিল ক্ষমতা এক জেনারেল থেকে আরেক জেনারেলের হাতে পড়েছে। সামরিক শাসনমুক্ত হয়নি জাতি। বরং নতুন করে সামরিক ফরমান জারি শুরু হয়। ক্ষমতা দখল করে ইয়াহিয়া যে ভাষণ দেয়, তাতে বাঙালির কাছে স্পষ্ট হলো যে, আর এক সঙ্গে থাকা যাবে না। আইয়ুবের দশ বছরের দুঃশাসন যেন অন্য জেনারেলের হাতে প্রলম্বিত হয়েছে কেবল। ষাটের দশক থেকে যে বাঙালি স্বাধিকারের জন্য লড়াই শুরু করে, দশকের শেষ প্রান্তে এসে সে লড়াইকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিতে থাকে। আজ থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবনাটা শেখ মুজিবুর তাঁর জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। সামরিক আইনের কাঠামোর মধ্যে হলেও ইয়াহিয়া গণচাপে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো।

সত্তরের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছ থেকে ছয় দফা ইস্যুতে ম্যান্ডেন্ট পেলেন। আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এককভাবে সরকার গঠনের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। শেখ মুজিব নির্বাচনকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর তো হলোই না, শুরু হয় ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানি সামরিকগোষ্ঠী জনগণের এ রায় আশা করেনি। তাই তারা তা মেনে নিতে গররাজি হয়ে ওঠে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে তা আবার স্থগিত করে। বাঙালি এত বড়ো বিজয় নস্যাতের পাকিস্তানি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ শুরু হয় সারা বাংলায়। এই প্রতিবাদ ছিল নজিরবিহীন। শহর-বন্দর-গ্রাম জেগে ওঠে স্বাধীনতার মহান লক্ষ্য সামনে রেখে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা জোরালো সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়। সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।

সারা বাংলা তখন শেখ মুজিবের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকদের অস্তিত্ব কেবল সেনা ছাউনিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবিকে স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করে। দেশজুড়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে স্বাধীনতার পক্ষে। শুরু হয় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। ছাত্রছাত্রী, যুবা-যুবতী থেকে শুরু করে পেশাজীবীরাও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিতে থাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে। পহেলা মার্চের পর বাঙালি বুঝে নেয়, পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে কোনো মীমাংসা সম্ভব নয়। তারা স্বাধীনতার পথকেই বেছে নেয়। শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে জনগণের সাড়া ছিল অভাবনীয়। সর্বত্র একই আওয়াজ– স্বাধীনতা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে শতাধিক বাঙালি শহিদ হয়। ইয়াহিয়া, ভুট্টোর সঙ্গে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনাকালে অনেকের মনে হয়েছে, রক্তপাত এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি বুঝে নেয়, রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের কোনো উপায় নেই। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ চলাকালে পাকিস্তানি বিমান ও হেলিকপ্টার সমাবেশ স্থলের ওপর বার বার চক্কর দেয়। হামলার পরিকল্পনাও ছিল তাদের তখন। আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই রাতের অন্ধকারে গোপনে ইয়াহিয়া, ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করে। আর দেশটিকে এক নিষ্ঠুর সামরিক আগ্রাসনের মুখে ঠেলে দেয়। ২৫ ও ২৬শে মার্চের মধ্যরাতের তথাকথিত অপারেশন সার্চলাইট চালিয়ে গণহত্যা শুরু করে। বাঙালি আজও ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস স্মরণ করে আসছে। মহান নেতা শেখ মুজিব ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতার কঠিন অভিযাত্রায় সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন। পুরো জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই ডাক শুনে দখলদার হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে হঠাতে। সর্বত্র রুখে দাঁড়ায় বাংলার জনগণ। নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে। বাঙালি জড়িয়ে পড়ে এক অসম যুদ্ধে, যে যুদ্ধ পাকিস্তানি জান্তা চাপিয়ে দিয়েছে তাদের ওপর।

পাকিস্তানি সেনারা গণহারে বাঙালি নিধনে মত্ত হয়ে ওঠে। রাস্তাঘাটে, রিকশায়, গাড়িতে, ঘরে, বাড়িতে ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয়প্রতিষ্ঠানে, ছাত্রাবাসে এবং যানবাহনে বাঙালি নিধন পর্ব অব্যাহত রাখে হানাদাররা। শুরু হয় নারী জাতির ওপর নৃশংস অত্যাচার, ধর্ষণ। বেয়নেটের ডগায় শিশুরা উড়তে থাকে রক্তাক্ত নিশানের মতো। অস্ত্র হাতে না ধরতে শেখা বাঙালি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকে বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে হানাদার ও তাদের দেশীয় সহযোগীরা দেশের শিক্ষিত গুণীজনদের ঘর থেকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে চোখ বেঁধে নির্যাতনের পর বধ্যভূমিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। মুক্তাঞ্চলে ১০ই এপ্রিল গড়ে ওঠে বাংলাদেশের প্রথম সরকার। সেই সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় যুদ্ধ। সারা বাংলা তখন জেলখানা। হানাদার ও তার সহযোগী আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি, রাজাকার ও মুজাহিদ বাহিনীর সম্মিলনে সারা দেশ নরকে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার জন্য বাঙালিদের করণীয় বিষয়ে ঘোষণা যেমন দেওয়া হতো, তেমনি পাকিস্তানিদের নিধনে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথাও বলা হতো। হানাদারদের অত্যাচারে দেশত্যাগে বাধ্য এক কোটি বাঙালি শরণার্থী সেদিন ভারতের মহানুভবতায় মাথা গোঁজার ঠাঁই ও খাবার পেয়েছিল। বাঙালির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসের এই হচ্ছে সার সংক্ষেপ। এর ভেতর কত শাখা, প্রশাখা, উপশাখা, ডালপালা বিস্তৃত রয়েছে যে, তার সবটুকু আজও জানা হয়নি সবার। বাঙালি ইতিহাস-সচেতন জাতি নয়; হলে তার রচিত ইতিহাস হতো সমৃদ্ধ এবং বিশ্বসেরা। কিন্তু আজ নানা বিকৃতি এসে ইতিহাসকে গ্রাস করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণায় কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যা হয়েছে, তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। মুক্তিযোদ্ধারা পরপারে চলে যাচ্ছেন। স্মৃতিকথা বলার ও লেখার মানুষ কমে যাচ্ছে। তাই অচিরেই ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু করা যেতে পারে। আর এ কাজটি সর্বাগ্রে করার দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধের প্রধান দল আওয়ামী লীগের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। পরাজিত শত্রুদের বাড়ছে আন্দোলন। পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারে সক্রিয়রা দেশে-বিদেশে চালাচ্ছে নানা ষড়যন্ত্র। সুবর্ণ জয়ন্তীকালে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মুক্তিকামী বাঙালির।

জাফর ওয়াজেদ: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘদিনের লাগাতার সংগ্রাম-জাত। একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি স্বাধীন পতাকার জন্য বাঙালি জাতি প্রায় হাজার বছর ধরেই সংগ্রাম করে আসছিল। ব্রিটিশ আমলে এ সংগ্রামের ধারা একটি ফুলে মুকুলিত হয়ে ওঠে। মুকুল ফুটে ওঠে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিন দফা ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতার চিন্তা একটি চারাগাছে পরিণত হয়। বিশ শতকের ষাটের দশক পুরোটুকুই ছিল বাঙালির স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতিকাল। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল স্বাধীনতার জন্য জনগণের সম্মিলিত ম্যান্ডেট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানের সীমাহীন বৈষম্য, দমননীতি, জুলুমের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করেন। ছয় দফা ঘোষণার সঙ্গে সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতি ও গণমাধ্যম দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমের একটি অংশ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নিরন্তর অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, 'শেখ মুজিব পাকিস্তান ভেঙে ফেলতে চান'। তাদের এ প্রচারণা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং পাকিস্তান ভাঙার দিকেই চিন্তা-চেতনায় তারা অগ্রসর হতে থাকে। গণমাধ্যমের একটি অংশ বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে নানাভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে, যার প্রভাবে সমগ্র জাতি মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য তৈরি হয়ে যায়।

ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এ দেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো ছিল একাট্টা। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার বিরুদ্ধে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে সংবাদপত্রগুলোর যৌথ সম্পাদকীয় ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেও একই ভূমিকা পালন করে সংবাদপত্রগুলো। জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরের বিলম্বে সংবাদপত্রগুলো আবারও যৌথ সম্পাদকীয় রচনা করে 'আর সময় নাই' শিরোনামে। এছাড়াও ১৯৬৯ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে এবং ১৯৭০ সালে নির্বাচনের সময় দেশের সংবাদপত্রগুলো ঢালাওভাবে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়ায় এবং জাতিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের সরকারি-বেসরকারি সংবাদপত্রগুলো একযোগে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে ত্বরান্বিত করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময়গুলোতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা থেমে ছিল না। বরং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও নানারকম সংবাদপত্র এ যুদ্ধকে দৃঢ়তর ও ঐক্যবদ্ধ জাতির আকাঙ্ক্ষাকে সঠিকভাবে প্রতিফলন ঘটাতে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত কিছু

সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের ভূমিকা ও তার পরিচয়টি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়:

১. ***সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*** : প্রথম প্রকাশ ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১। প্রকাশের স্থান ছিল বরিশাল। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর এটাই ছিল প্রথম পত্রিকা। সম্পাদনায় ছিলেন এম. এম. ইকবাল, মিন্টু বসু, হেলালউদ্দিন। প্রকাশনায় ছিলেন হারেস এ. খান, এনায়েত হোসেন ও মুকুল দাস।

২. ***সাপ্তাহিক জয়বাংলা*** : প্রথম প্রকাশ ১৯৭১ সালের ১১ই মে তারিখে। প্রথমে এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র। পরে পত্রিকাটি মুজিবনগর সরকারের নিয়মিত রাজনৈতিক মুখপত্র রূপে কাজ করে। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। সম্পাদক ছিলেন আহমদ রফিক। তবে এটি ছিল ছদ্মনাম। টাঙ্গাইলের সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ছিলেন এর আসল সম্পাদক। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মতিন আহমদ চৌধুরী। পত্রিকাটির একটি সংখ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। পরবর্তীতে ১৬ই ডিসেম্বরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

৩. ***সাপ্তাহিক বঙ্গবাণী*** : প্রথম প্রকাশ ১৯৭১ সালের ১৩ই জুন। 'স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র'– এ কথা পত্রিকাটিতে লেখা থাকত। সম্পাদক ছিলেন কে. এম. হোসেন। নওগাঁ থেকে মুদ্রণ এবং এম. এ. জলিল কর্তৃক প্রকাশনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এম. এ. জলিল ছিলেন সে সময়ের নওগাঁর ছাত্রনেতা।

৪. ***সাপ্তাহিক স্বদেশ*** : ১৯৭১ সালের ১৬ই জুন প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন গোলাম সাবদার সিদ্দিকী। তিনি কবি ছিলেন এবং অনিয়মিত হলেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো।

৫. ***সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*** : সম্পাদক ছিলেন আবুল হাসান চৌধুরী। তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ছেলে। প্রকাশক ছিলেন আবদুল মমিন।

৬. ***রণাঙ্গন*** : প্রথম প্রকাশ ১১ই জুলাই ১৯৭১। টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিফৌজের বেসামরিক দপ্তর থেকে প্রকাশিত। সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন রণদূত। এটি ছিল কাদেরীয়া বাহিনীর মুখপত্র।

৭. ***সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা*** : রাজশাহী এলাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন এস. এম. এ. আল মাহমুদ চৌধুরী। মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামানের স্ত্রী জাহানারা কামারুজ্জামান এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে কোনো নারীর সম্পাদনায় এটাই প্রথম পত্রিকা।

৮. ***সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ*** : ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত। পত্রিকাটি ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়মিত মুখপত্র। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকে বেশি বেশি প্রচার করেছে পত্রিকাটি।

৯. ***সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*** : মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন সরকার কবীর খান এবং কে. জি. মুস্তাফা প্রকাশক ছিলেন।

১০. ***সাপ্তাহিক বাংলার মুখ*** : প্রথম প্রকাশ ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে। সম্পাদক ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান আশরাফী।

১১. ***সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ*** : সম্পাদক ছিলেন নূরুল আলম এবং রফিক হায়দার ছিলেন এর প্রকাশক। পত্রিকাটিতে সাধারণত গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে নিবন্ধাদি প্রকাশিত হতো।

১২. ***সাপ্তাহিক জন্মভূমি*** : সম্পাদক ছিলেন মোস্তফা আল্লামা। প্রিন্টার্স লাইনে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত বলা হয়েছে।

১৩. ***সাপ্তাহিক বাংলার বাণী*** : ১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে পত্রিকাটি একাত্তরের মার্চের আগেই ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মুজিবনগরে পত্রিকার সম্পাদক হন আমির হোসেন।

১৪. ***সাপ্তাহিক নতুন বাংলা*** : সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। তদানীন্তন ন্যাপের সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল পত্রিকাটি।

১৫. ***সাপ্তাহিক মুক্ত বাংলা*** : ১৯৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিলেটবাসীদের মুখপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশস্থল ছিল আসামের করিমগঞ্জ। সম্পাদক ছিলেন আবুল হাসনাত সাহাদত খান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম।

১৬. ***সাপ্তাহিক বাংলা*** : ১৯৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। মুজিবনগর ও সিলেট থেকে একযোগে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন মাইকেল দত্ত।

১৭. ***সাপ্তাহিক দাবানল*** : ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মো. জিনাত আলী। মুদ্রণে ও প্রকাশনায় ছিলেন মো. সেলিম।

১৮. ***সাপ্তাহিক প্রতিনিধি*** : ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আহমেদ ফরিদউদ্দিন।

১৯. ***সাপ্তাহিক মুক্তি*** : ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন শরাফউদ্দিন। মূলত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য সাধনা প্রকাশেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

২০. ***সংগ্রামী বাংলা*** : ১৯৭১ সালের ১৮ই অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবদুল রহমান সিদ্দিক। ১৯৫৮ সালে জামালপুরের বিপ্লবী নেতা আলী আসাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য যে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স গঠিত হয়েছিল, তাঁরই স্মরণে প্রথম সংখ্যাটি 'আলী আসাদ' সংখ্যা নামে প্রকাশিত হয়।

২১. ***সাপ্তাহিক অগ্রদূত*** : ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি রংপুরের রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে সাইক্লোস্টাইলে বের করা হতো। সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাদাকত হোসেন এবং নূরুল ইসলাম।

২২. ***মুক্তবাংলা*** : সম্পাদক ছিলেন 'ডিজি', এটা ছিল একটি ছদ্মনাম। এক পৃষ্ঠার এই ক্ষুদে পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোনো এক স্থান থেকে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা হতো।

২৩. ***জাগ্রত বাংলা*** : এটিও শত্রু পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের ভেতরে

হাফিজউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত মুক্তিফৌজের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটি আফসার ব্যাটেলিয়ন ও কাদেরীয়া বাহিনীর সাফল্যের খবরাখবর প্রকাশ করত।

২৪. ***সাপ্তাহিক রণাঙ্গন*** : পত্রিকাটি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল রংপুর থেকে মুক্তিকামী জনতার মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন মুস্তফা করিম। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মতিয়র রহমান এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন করিমউদ্দিন আহমেদ।

২৫. ***সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*** : সাপ্তাহিক পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত দেশের ভেতর থেকে প্রকাশিত হওয়ায় এর সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছিল। সম্পাদকের ছদ্মনাম ছিল কীর্তি এবং মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ছিল তড়িৎ।

২৬. ***পাক্ষিক স্বাধীন বাংলা*** : ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির মুখপত্র। প্রকাশিত হয় ১লা অক্টোবর। পত্রিকাটি দীর্ঘকালীন গেরিলা যুদ্ধের সমর্থক ছিল।

২৭. ***দেশবাংলা*** : ১৯৭১ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ফেরদৌস আহমদ কোরেশী। মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলেন দীপক সেন। পত্রিকাটি বাংলাদেশের জনযুদ্ধের মুখপত্র রূপে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল।

২৮. ***দুর্জয় বাংলা*** : ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন তুষারকান্তি কর। এটি প্রকাশিত হতো সিলেট অঞ্চল থেকে।

২৯. ***স্বাধীন বাংলা*** : ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন শামসুল আলম দুদু।

৩০. ***সাপ্তাহিক আমার দেশ*** : ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন খাজা আহমদ। নোয়াখালী অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের খবর বেশি থাকত দেখে মনে হয় এটা নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হতো।

৩১. ***সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা*** : সম্পাদক ছিলেন মো. এমদাদুল হক। পত্রিকাটি তেঁতুলিয়া থেকে প্রকাশিত হতো। প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ঈদের উৎসব উপলক্ষে পত্রিকাটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছিল।

৩২. ***সাপ্তাহিক অভিযান*** : সম্পাদক ছিলেন কবি সিকান্দার আবু জাফর।

৩৩. ***সাপ্তাহিক Bangladesh*** : ১৯৭১ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটা ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বহির্বিশ্ব প্রচার দপ্তর কর্তৃক মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। পত্রিকাটি প্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশিদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ধারণা তুলে ধরা।

৩৪. ***পাক্ষিক The Nation*** : ১৯৭১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি ইংরেজি পাক্ষিক। সম্পাদক ছিলেন আবদুস সোবহান। দ্য নেশন পাবলিকেশনস মুজিবনগর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ পত্রিকাটিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি ভাষার পাঠক। এরা যাতে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝতে পারে তার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল পত্রিকাটিতে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রেসে ছেপে, কিছু সাইক্লোস্টাইল মেশিনে মুদ্রিত হয়েছে। হাতে লিখেও মুক্তিযোদ্ধারা বুলেটিন আকারে পত্রিকা প্রকাশ করেছে। পত্রিকাগুলোর নামও থাকত *গেরিলা*, *যোদ্ধা*, *যুদ্ধ*, *লড়াই*, *মুক্তি*, *স্বাধীনতা* ইত্যাদি। এগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের আঞ্চলিক খবরাদি প্রকাশিত হতো।

ছাপা পত্রিকাগুলোর বেশির ভাগই ছিল সাপ্তাহিক। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ কিংবা মুজিবনগরের ঠিকানা থাকত, কিন্তু বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতায়, আগরতলায় অথবা সীমান্তবর্তী জেলার কোনো প্রেস থেকে। এর মধ্যে সাপ্তাহিক পত্রিকাই বেশি ছিল। কিছু পত্রিকা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের মুখপত্র। অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কিছু কিছু পত্রিকা আঞ্চলিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বেশির ভাগ পত্রিকার নামে 'বাংলা' শব্দটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে কৌশলগত কারণে। অনেক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সংসদ সদস্যরা। পৃষ্ঠপোষক বা প্রকাশক, এমনকি সম্পাদক হিসেবেও তাদের নাম থাকত। যদিও এসব পত্রিকার বেশির ভাগই ছিল অনিয়মিত, তথাপি মুক্তিযোদ্ধা ও অবরুদ্ধ বাঙালিসমাজে তা বিশেষ অনুপ্রেরণা ও প্রভাব রেখেছে। মানুষ যুদ্ধের খবরাখবর পেয়েছে এবং দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে আশাবাদী হয়েছে এসব পত্রপত্রিকার প্রচার-প্রচারণা থেকে।

ড. মোহাম্মদ হাননান: লেখক ও গবেষক, drhannapp@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু ওয়াল অব ফেইম-এর উদ্‌বোধন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ ৪ঠা নভেম্বর জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-তে বঙ্গবন্ধু ওয়াল অব ফেইম উদ্‌বোধন করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বঙ্গবন্ধু ওয়াল অব ফেইম তৈরি করেছে। ওয়ালে শ্রম অভিবাসনের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে– 'শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা– অভিবাসনে আনব মর্যাদা ও নৈতিকতা' শীর্ষক স্লোগানটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এরপর মন্ত্রী জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রদত্ত ওয়ানস্টপ পদ্ধতিতে সরাসরি ২১টি দেশে ইমিগ্রেশন সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান প্রমুখ।

প্রতিবেদন: নিঘাত সুলতানা চয়ন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

২০২০ সালের ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'এই বাংলাদেশ লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, জীবনানন্দের বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশ শাহজালাল, শাহ পরান, শাহ মকদুম, খান জাহান আলীর বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ শেখ মুজিবের বাংলাদেশ; সাড়ে ষোলো কোটি বাঙালির বাংলাদেশ। এ দেশ সকলের। এ দেশে ধর্মের নামে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মান্ধ নয়। তাই ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করবেন না। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রাখেন। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান– সকল ধর্মের-বর্ণের মানুষের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। করোনা মহামারি কবলিত 'মুজিববর্ষে' ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে মানুষের এগিয়ে চলার মহামন্ত্র আজ বিশ্ববাসী শুনতে পাচ্ছে। আসলে গভীরতর অর্থে, চেতনার পরিমাপে মুক্তিযুদ্ধের একটি ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক রূপ রয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি অপশাসনবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের সেই অনিবার্য চেতনা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। 'মুক্তি' আন্দোলনের গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার স্পর্শে এক অপরিমেয় সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল আমাদের জনতা। সেই উজ্জীবনী শক্তি একাত্তরের রক্তস্নাত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমান সময়েও চলিষ্ণু।

সংগত কারণেই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে নতুন করে মূল্যায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঘটনা সদ্য স্বাধীন দেশের বাস্তবতায় ছিল ভয়ংকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এ সময় থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নবতর অভিযাত্রা ব্যাহত হয়। যুগান্তকারী সব পরিবর্তন-সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার পরই আবার রুদ্ধ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের মুক্ত চেতনা, গণতন্ত্র ও শিল্পবিপ্লবের অবাধ বিকাশ হয় প্রলম্বিত। দীর্ঘ ২১ বছর পর পুনরায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন, জয় বাংলা ধ্বনিত হলো এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো। আর ২০০৮ ও ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে একাধারে ১২ বছরের অধিককাল ক্ষমতায় থাকায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আপামর জনগণের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম তথা আড়াই কোটি তরুণ ভোটার আজ উজ্জীবিত। এজন্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বলে থাকেন– মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়। তাঁর মতে, সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। 'মুজিববর্ষে' এ কথার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, 'আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের। আমি সেই লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি।' রাষ্ট্রনায়কের এই কথার মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভিব্যক্তি রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করা হয়েছিল। আর সেই চেতনা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন শেখ হাসিনা। অন্যদিকে একজন রাষ্ট্রনায়কের প্রধান কর্তব্য জনগণের সেবা করা যা বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংগ্রাম আর সরকারপ্রধান হিসেবে দেখিয়ে গেছেন। দেশপ্রেমিক শাসক আর জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার লালন করার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রকাশ পায়। আমরা মনে করেছিলাম, রণাঙ্গনের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানপন্থিদের অস্তিত্ব বিলীন হবে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে দেখলাম, বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর ঐ বাংলাদেশবিরোধীরাই ২১ বছর একাধারে এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে এবং উপহার দিয়েছে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাস আর দুর্নীতি। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে।

এদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আওয়ামী লীগের দিক থেকে উত্থাপিত হয়েছে বার বার। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে প্রগতিপন্থি। কেননা আমরা তাঁদেরই নেতৃত্বে স্বাধীনতা পেয়েছি।

মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম অনুধ্যান। কারণ আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির একেবারে মর্মমূলে রয়েছে গণতন্ত্রের আদর্শ। বাঙালির গণতান্ত্রিক চেতনাকে যখন রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল তথাকথিত পাকিস্তান, তারই প্রতিবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে একাত্তরে ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হয়নি বলে গণযুদ্ধ হয়েছিল। এটা তাৎক্ষণিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ। অবশ্য গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করার ঘটনা অনেক দিনের। সেই ইতিহাসে বাংলাদেশের মানুষকে, নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও আপোশহীন নেতৃত্বে বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের এগারো দফা ও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে বাঙালি জাতি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে বৈধ ভিত্তি পায় বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। আবার এ কথাও সত্য যে, দীর্ঘ ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথ মসৃণ ছিল না। কখনো একদলীয় শাসন ব্যবস্থায়

আর একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থানে পিছিয়ে পড়েছে এ দেশ। ২০২১ সালে করোনা মহামারি পরিবেশের মধ্যে যখন বাংলাদেশে 'মুজিববর্ষে' বিজয় দিবস পালন করা হচ্ছে, তখন গণতন্ত্রের মূল্যায়ন হচ্ছে পুনরায়। ফলে ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রসঙ্গ।

২

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা পেয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সংগীত। ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দুই লক্ষ মা-বোনের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৭১-এ। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা ও মুক্তির যে ডাক তিনি দিয়েছিলেন সেখান থেকে যাত্রারম্ভে অতীতের সংগ্রামের ইতিহাসকে স্মরণ করে ভবিষ্যৎ-প্রসারী করতে হবে দৃষ্টিভঙ্গিকে। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুজিবনগর সরকার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রথম বাংলাদেশ সরকার হিসেবে খ্যাত এই সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, '১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল।... সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সে ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি।'

সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা' মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। অন্যদিকে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪টি মূলনীতিও আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অংশ। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সংসদে পাস হয় বাংলাদেশের সংবিধান। গত ৫০ বছরে সংবিধান সংশোধন হয়েছে ১৬ বার। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিভিন্ন সময়ে অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসে এই সংবিধানের চার মূলনীতিও বদলে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালের ৩০শে জুন পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপের পাশাপাশি অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বিবেচনায় সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান রাখা হয় এ সংশোধনীতে। এছাড়া এ সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধান অনুসারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হলো– স্বাধীনভাবে আমাদের বেঁচে থাকা; ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি, সকল মৌলিক অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত করা; অর্থাৎ বৈষম্যহীন, মুক্ত এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্রে বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে আমাদের বিকাশের সুযোগ থাকা এবং রাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা আমাদের মানব সত্তা বিশ্বে মর্যাদা পাওয়া– সব মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

৩

বাঙালির যা কিছু গৌরবের তার স্বীকৃতি ঘটেছে আন্তর্জাতিক পরিসরে যার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ সরাসরি সম্পৃক্ত। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে করণীয় বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ 'ইউনেসকো ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত করে 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২৫শে মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস ঘোষণার জোর দাবি উঠেছে। কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালামের উদ্যোগে এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেসকো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নকশিকাঁথা এবং সিলেটের শীতলপাটি ইতোমধ্যে ইউনেসকোর বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অগ্রসর না হলে এসব অর্জন সম্ভব হতো না।

৪

প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। তাঁর শাসনামলে ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, '... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না– চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কিন্তু সেই চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; তার জন্য সামগ্রিক এবং নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।' স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) শেখ হাসিনা সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। 'রূপকল্প–২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলনে সবাইকে অংশীদার হতে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন গত মহাজোট সরকারের সময় প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯, জাতীয়

মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯, চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন ২০১০, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ ইত্যাদি। এসব আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তর দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীলসমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করতে দেশের যুবসমাজ বড়ো শক্তি এবং অপার সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ বলতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বাংলাদেশকে বুঝতে হবে। এই বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়েছে। শিক্ষানীতি ২০১০-এ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তিন অংশে বলা হয়েছে: 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো হবে'। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শানিত।

৫

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালিত হচ্ছে রাষ্ট্র। এজন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে ৮১ বছরের পরিকল্পনা সংযুক্ত হয়েছে। ২০০৮ সালে দিনবদলের সনদ নামে নির্বাচনি ইশতাহারে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের প্রতিশ্রুতি ছিল আওয়ামী লীগের। টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার সময় ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের ইশতাহারের স্লোগান ছিল– শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সেই ইশতাহারে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছিল দলটি। ১২ বছরে এই দুই ইশতাহারে যেসব প্রতিশ্রুতি ছিল সেগুলোই ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতির পর এখন লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে তোলা। গত ইশতাহারে ৮১ বছরের অর্থাৎ ২০১৯ সাল থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। ডেল্টা প্ল্যানের কথা ইতোমধ্যে সকলে অবগত হয়েছেন। এছাড়া ইশতাহারে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মাদক নির্মূলের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত। দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেতু, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় ছিল গত ইশতাহারে। দেশের প্রবৃদ্ধি যেন দুই অঙ্কে পৌঁছায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘোষণা ছিল সেখানে। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশবাসী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এখন, অপুষ্টির অভিশাপ দূর হতে যাচ্ছে, দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচেছে, নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে, শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠছে, শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছে; প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বেকারত্বের অবসান ও কোটি কোটি যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত, ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটাচ্ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, পরিকল্পিত নগর-জনপদ গড়ে উঠছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ সমৃদ্ধির সোপানে পা রাখছে। রাজনীতি থেকে হিংসা, হানাহানি, সংঘাতের অবসান হচ্ছে, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের ধারা থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে; গড়ে উঠেছে একটি সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে জাতিকে উপহার দেওয়া হবে নতুন ভিশন, নতুন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প–২১০০। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র।

৬

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামো পেয়েছি। যে রাষ্ট্রের ভিত্তি গণতন্ত্র, সামাজিক সাম্য এবং মৌলিক অধিকার চর্চা। আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত। যে রাজনৈতিক সংগ্রাম আর ত্যাগের মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রের জন্ম সেই ইতিহাসকে যথাযথ উপলব্ধি করাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনার মধ্যে গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের আদর্শ রয়েছে, মুক্তির স্বপ্ন আছে আর আছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করার মূল্যবোধ। অন্যদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্য ও মানবাধিকার আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের অগ্রগতির অন্যতম অনুপ্রেরণা যা আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম অনুষঙ্গ।

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস: ইউজিসি পোস্ট ডক্টোরাল ফেলো, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম এবং অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, drmiltonbiswas1971@gmail.com

শক্তপোক্ত হোক চতুর্থ স্তম্ভ

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

> আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সহযোগিতা করব।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে উপরের কথাগুলো বলেছিলেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো কত প্রাসঙ্গিক! আর এটাই বিস্ময়ের জন্ম দেয়! এখনো গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা নিয়ে কথা হয়! এখনো ভাবতে হয়– সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো কীভাবে পরিচালিত হবে!

মহাকালের দুটি মহৎ ধারার সংগমকালে, আমরা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করছি, উদ্‌যাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের ৫০ বছর।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৪ঠা মে পিআইবি মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *কারাগারের রোজনামচায়* লিখেছিলেন, 'সত্য খবর বন্ধ হলে অনেক আজগুবি খবর গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে, এতে সরকারের অপকার ছাড়া উপকার হয় না।' (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৭৯)। মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার এবং সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি তাঁর বইগুলোতে অসংখ্যবার লিখেছেন এবং সবসময় এ নিয়ে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। সেই সত্য ভাষণের যথাযথ প্রতিফলনও তিনি দেখিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির মধ্যে একটি হলো গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই প্রধান। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে দেশটি কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করাই গণতন্ত্র। এই মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে মত প্রকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতা অন্যতম।

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৩৯(১)-এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে এবং ৩৯(২)-এ সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

তারও অনেক পরে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, 'রাষ্ট্রে গণমাধ্যম স্বাধীন হলে এমনকি দুর্ভিক্ষও ঠেকিয়ে দেওয়া যায়। অজ্ঞতা ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে, সচেতন ভোটাররা তখন খারাপ শাসককে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারে। আবার গণমাধ্যমের সঠিক চর্চা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মাঝে সেতু তৈরি করে। ... যেসব দেশে গণমাধ্যম স্বাধীন, সেসব দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।' জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন, *হাঙ্গার অ্যান্ড পাবলিক অ্যাকশন (ক্ষুধা ও জনকর্মসূচি)* নামের বইটি লিখেছিলেন ১৯৮৯ সালে।

মনে করা হয়, জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম ১৬নং সূচকটি। এই সূচকের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ... টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা। সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ তৈরি করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। অর্থাৎ সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে লক্ষ্যমাত্রার অন্যান্য সূচকগুলো অর্জন সম্ভব। এখানেই শক্তিশালী ও স্বাধীন গণমাধ্যমের কার্যকারিতার প্রসঙ্গ অনিবার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সূচক অনুযায়ী সমাজে জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতেই হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার পরিচালনাকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে সুষ্ঠুভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ইশতাহারের ৩.৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলটি যেসব লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, গত তিন বছরে তার বেশির ভাগ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং বাকিগুলোর কাজও প্রক্রিয়াধীন।

জাতির পিতার আদর্শকে অনুধাবন ও পদক্ষেপকে মাথায় রেখে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

নিশ্চিত করার পাশাপাশি এই খাতকে শক্তিশালী করতে বেশ কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন। তার সর্বশেষ সংযোজন– ডাউনলিংককৃত বিদেশি টিভি চ্যানেলে পণ্যের বাণিজ্যিক প্রচার বন্ধ করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট আপলোডের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও অবৈধ ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সার্ভিস সংযোগ উচ্ছেদ স্থানীয় গণমাধ্যমকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখছে।

তারও আগে, পেছনে ফিরে তাকালে, শেখ হাসিনার সরকারের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) প্রথমবারের মতো বেসরকারি টেরেস্ট্রিয়াল টিভি চ্যানেল (একুশে টিভি) অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দেশে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগের সূচনা হয়।

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বৃদ্ধিই গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। সাংবাদিকসমাজ ও সংবাদমাধ্যমের সমস্যা দূর করে সাংবাদিকতাকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণমুখী করতে সরকার দেশের গণমাধ্যমকে সবধরনের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মত প্রকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছে। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শেখ হাসিনার সরকার 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন করে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। যুগান্তকারী এ উদ্যোগের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গণমাধ্যমকর্মীসহ আপামর জনসাধারণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাবার একটি আইনি সুযোগের দ্বার খুলে যায়। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ আইনে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে সাংবাদিকদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য দিতে বাধ্য। ফলে সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহে তথ্য প্রদানকারী নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২,২৫৪ জন। ২০০৯ সালের জুলাই থেকে গত ১২ বছরে এ আইনের আওতায় সাংবাদিকসহ মোট ১,১৯,৮৩১ ব্যক্তিকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক কর্মকর্তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সাংবাদিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতোমধ্যে নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের সাংবাদিক, ক্যামেরাপারসন ও অন্য সহযোগী কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির কথাও ভাবছে।

সংশোধিত পেনাল কোডের অধীনে সম্পাদকদের বিরুদ্ধে কোনো মানহানি মামলায় বিজ্ঞ আদালতের সমন ছাড়া শুধু পুলিশি ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যাবে না। এ ধরনের আইনি সুরক্ষা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখছে। সাংবাদিক, লেখক ও ব্লগারদের ওপর অপশক্তির ও জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ফলে আপামর জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে গণমাধ্যম। সারা দেশে বিদ্যুৎ, উচ্চ গতির ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, অসংখ্য টিভি চ্যানেলের সহজলভ্যতা তথ্যকে জনগণের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। পাশাপাশি ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং রেগুলেশন ২০১০, বেসরকারি এফএম বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪ এবং জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ (২০২০ সালে সংশোধিত) প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

গণমাধ্যমকে আরও গণমুখী করতে জাতীয় অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে এ পর্যন্ত ১০৮টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ১৪টি আইপিটিভি, ১৪টি টিভি চ্যানেলের অনলাইন পোর্টাল এবং ১৫৪টি পত্রিকার অনলাইন নিউজ ভার্সনকে অনুমোদন দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব নীতির সুবাদে সারা দেশে বিপুলসংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মিডিয়াভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা সাতশোর বেশি। এদের মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫৬০টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ২৫৫টি। সরকার এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৭টি এফএম রেডিও ও ৩১টি কমিউনিটি বেতারকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৩১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২২টি এফএম রেডিও ও ১৭টি কমিউনিটি বেতারকেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রচারে রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ভারতের দূরদর্শন ডিশবিহীন সে দেশে সম্প্রচার করছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর উৎক্ষেপণ দেশের গণমাধ্যম অঙ্গনকে শক্তিশালী করেছে। দেশে টিভি চ্যানেলগুলো এখন অনেক কম খরচে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ করা হলে এ সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ

জোরদার হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৭ কোটি মোবাইল সিম ও ১১ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, সমাজের ওপর নতুন ধারার গণমাধ্যম–'নিও মিডিয়া'র ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরছে। অভার দ্য টপ (ওটিটি) মিডিয়া সার্ভিস, ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সার্ভিস নীতিমালা ও আইপি (ইন্টারনেট প্রোটকল) টিভি/ আইপি রেডিও সেবা রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা নিয়েও কাজ করছে মন্ত্রণালয়।

দেশে ক্রমবর্ধমান গণমাধ্যম অঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে ২০১৪ সালে সরকার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে ১০৪ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬তলা বিশিষ্ট তথ্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অত্যাধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সহায়তা প্রদানকারী শীর্ষ সরকারি সংস্থা– তথ্য অধিদফতর সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে বিভাগীয় অফিস স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে সকল বিভাগে তথ্য অধিদফতরের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ তাদের নিজেদের কর্মস্থলে চাকরির অনিশ্চয়তায় ভোগেন, যা স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। তাদের চাকরির এই অনিশ্চয়তা দূর করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করতে যাচ্ছে গণমাধ্যম কর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন, যা বর্তমানে অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন গণমাধ্যমবান্ধব বর্তমান সরকারের আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারি অনুদানে পরিচালিত এ ট্রাস্টের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ৫,২৬৩ জন অসচ্ছল সাংবাদিককে ১৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারির সময় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি সাংবাদিক পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩ কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেন।

তবে অনেক সময় গণমাধ্যমকেও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। নানান মতাদর্শের ভিন্ন আঙ্গিকের সংবাদ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে গণমাধ্যম অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে। গণমাধ্যমের এ ভূমিকা ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে হলুদ সাংবাদিকতা, অপসাংবাদিকতার মতো সমস্যার কারণে। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের সুবিধা নিয়ে সুবিধাবাদীচক্র অসত্য, বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে দেখা যায়। আমাদের দেশে নতুন শতকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের বিস্ফোরণে অনেক টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের আগমন ঘটে। সম্প্রতি ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমে জনসাধারণ সরাসরি মত প্রকাশ করতে পারছেন। এখন আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সংবাদপত্রের ওপরই নির্ভর করে না। এতে যুক্ত হয়েছে সামাজিক মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার) ও ব্লগ। তবে এসব মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় অনেক সময় ভুল সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়, এর ফলে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়। পুঁজিপতি মালিক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রভাবও স্বাধীন সাংবাদিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সংবিধানস্বীকৃত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার সমুন্নত রাখতে সকল প্রকার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দায়িত্ব।

শত প্রতিকূলতা ও ঝুঁকি সত্ত্বেও গণমাধ্যম দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রযাত্রায় সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে অমূল্য অবদান রাখছে। এই ভূমিকা অব্যাহত রাখতে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তাসহ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের উপযোগী পরিবেশের উত্তরোত্তর বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সদা সচেষ্ট। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ও সুশাসন সুদৃঢ়তর করতে সরকারের পদক্ষেপ তখনই সার্থকতা পাবে যখন গণমাধ্যমও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ রাখবে শতভাগ। পাশাপাশি নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল হয়ে দায়িত্ব পালনের প্রতি গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও নিষ্ঠাবান থাকতে হবে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। আর এ অগ্রযাত্রায় দেশের মানুষের পাশে থেকে সরকারকে সহায়তা করেছে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম।

সবশেষে জনকল্যাণে গৃহীত সরকারের উদ্যোগকে সফলতার আলো দেখানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের শক্তিশালী ভূমিকার জ্বলজ্বলে উদাহরণ দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই। এই তো সর্বশেষ গত প্রায় দুই বছর করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের সফলতায় সহায়ক ভূমিকা রাখল আমাদের গণমাধ্যম। করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে দেশের গণমাধ্যম প্রমাণ করেছে জনমুখী দায়িত্ব পালনে তারা ইচ্ছুক। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ইতিবাচক দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যম যদি এভাবেই একনিষ্ঠ থাকে, তবেই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন সার্থক করে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের মর্যাদায় আসীন হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথ মসৃণতর হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সবার আকাঙ্ক্ষা তাই, আমাদের চতুর্থ স্তম্ভ হোক আরও অনেক বেশি শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল।

পরীক্ষিৎ চৌধুরী: সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য অধিদফতরে কর্মরত, 1parcho@gmail.com

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী শিক্ষা ভাবনা

ড. মো. আব্দুস সামাদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পিতা, যাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল প্রথমত. বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, দ্বিতীয়ত. এ দেশের মানুষের সুখী, সমৃদ্ধশালী জীবন, আন্তর্জাতিক দরবারে জাতিকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর পুরো জীবন কেটেছে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে। বাঙালির মানসিক উপনিবেশ থেকে মুক্তির, স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের প্রধান শক্তি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। যাঁর জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না, আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গণমুখী শিক্ষা, এ বিষয়টি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে গণমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি, নিয়েছেন নানাবিধ উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুর সেসব গণমুখী শিক্ষা ভাবনা আলোকপাত ও আলোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্তই হলো শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য যে শিক্ষা, জনগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে গণমুখী শিক্ষা বলে। গণমুখী শিক্ষার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভারতে মেকলে ১৮৩৫ সালে শিক্ষার এরূপ বিস্তারের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৩৭ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকশিক্ষার বিষয়ে বলেন, 'শিক্ষা বিষয় মাত্রই বাংলার সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এ অধ্যবসায়ের লক্ষ্য। ... দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না। তাই বিদ্যার আলো পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই'। শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই বঙ্গবন্ধু গণমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। শিক্ষার আলোকে তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর ৯ ও ১০ নং দফায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

ক. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

খ. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল/রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১৯৫৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, 'সিংহলে এম. এ. ডিগ্রি লাভ পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, অথচ আমাদের দেশে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোনো সুযোগ নাই ...।'

তাঁর এ বক্তব্য থেকেই বুঝা যায় যে, শিক্ষাকে গণমুখী করার পরিকল্পনা বহু বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর মনে ছিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি পশ্চিম পাকিস্তান গ্রহণ করেছিল। তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু রুখে

দাঁড়িয়েছিলেন। বিভিন্ন সময় কারাবরণসহ নানা নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তিনি অনুভব করেন যে, ১৯৪৭ সালে এ অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু বেতার-টেলিভিশনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত তুলে ধরেন। তিনি সেখানে বলেন,

> সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও বেশি নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল কলেজ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তির ডাক দেন। নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অহিংস, অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয়। এক রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মানুষ বাংলাদেশের জন্ম দেখতে পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে জাতিকে এক অনন্য সংবিধান উপহার দেন। এ সংবিধানে শিক্ষাকে গণমুখী করার উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গবন্ধু একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করার পক্ষপাতী ছিলেন।

আমাদের সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু নিজস্ব উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রথমে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয় তাতে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ করা হয়। তিনি দেশের ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা ছিল, বঙ্গবন্ধু ১,৫৭,৭৪২ জন শিক্ষকের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা জাতির জন্য কতটা জরুরি। গণমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও শক্তিশালীকরণে সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭০ সালের যুগান্তকারী নির্বাচনের আগে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিতে কলেজে কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে জুলাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ৩৬টি অধ্যায় বিশিষ্ট ৪৩০ পৃষ্ঠার কমিশনের রিপোর্ট ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে পেশ করা হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে যুগান্তকারী এ শিক্ষা কমিশনের উদ্‌বোধনের সময় বঙ্গবন্ধু বলেন,

> বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ ছিল অনন্য। যেমন: সেখানে এক ধারা শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা থাকবে না বলা হয়। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করা হবে, ইংরেজি ভাষা চালু করার কথা বলা হয় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে। সংবিধানের মূল চারটি নীতি, যথা– ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম, বিষয়বস্তু প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা, কৃষি, আইন, ললিতকলা প্রভৃতি মূল বিষয়ে শিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনার রূপরেখা কমিশনের প্রতিবেদনে আনা হয়। সব ধর্মের আলাদা আলাদা ধর্ম শিক্ষার পরিবর্তে সমন্বিত নীতিশিক্ষা নামক পুস্তক প্রবর্তনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়– নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির (১৪-১৭ বছর বয়সে) প্রতিবছর সাড়ে ৪ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশোনা ত্যাগ করে। জীবিকা অর্জন সহজ করার জন্য নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষাক্রমকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলা হয়। বৃত্তিমূলক ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা হবে তিন বছরের।

গণমুখী, সমাজমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, পরিবেশ ও চাহিদাভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষার যে সুপারিশ করা হয়েছে কুদরত-ই-খুদা কমিশনে, তা বঙ্গবন্ধুরই গণমুখী শিক্ষা ভাবনা। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ১.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর বহুমুখী ও জনকল্যাণকামী নানা উদ্যোগ ও ভাবনা নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু স্ব-উদ্যোগে সেখানে গণমুখী শিক্ষার শতভাগ প্রতিফলন পাওয়া যায়। কমিশনের রিপোর্ট জমা হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু বেশ কিছু গণমুখী শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রতিরক্ষা খাত অপেক্ষা শিক্ষা খাতকে অধিক বরাদ্দ দেওয়ার মতো জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর গণমুখী শিক্ষা ভাবনা তাঁর সারা জীবনের সুচিন্তার ফসল হিসেবেই দেখা হয়।

বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যে শিক্ষানীতি অর্থাৎ ২০১১ সালে যে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত গণমুখী শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সুশিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, 'জনগণ টাকা দেয় ছাত্রগণকে মানুষ হবার জন্য, মানুষ হতে হবে– আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে আমরা যেন মানুষ হই।'

বঙ্গবন্ধুর জীবন ছিল খুব স্বল্প সময়ের। এ স্বল্প সময়ে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। তবে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন রেখেছিলেন গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সম্পাদিত, *হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা, বৈশাখী প্রকাশনী, ২০১১

২. সৈয়দ আবুল হোসেন সংকলিত, *বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, শব্দশৈলী, ২০১৮

৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮৩

৪. এ. এইচ. খান সম্পাদিত, *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম, ২০১০

৫. মিজানুর রহমান মিজান সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা, নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯

৬. *The Dawn*, Karachi, 8th March, 1971

৭. *The Statesman,* New Delhi, 14th April, 1971

৮. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বঙ্গবন্ধু', প্রথম দর্শনে বঙ্গবন্ধু, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১০

৯. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৯০৪, ৯২০

ড. মো. আব্দুস সামাদ: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, abdus.samad.history@gmail.com

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ি,
সুশাসন প্রতিষ্ঠা করি

'WORLD LEADERS ON BANGABANDHU AND BANGLADESH' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২৮শে অক্টোবর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে *'WORLD LEADERS ON BANGABANDHU AND BANGLADESH'* শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যেসব বিশ্বনেতাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও কুশলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে চলতি বছরের ১৭-২৬শে মার্চ অনুষ্ঠিত দশ দিনব্যাপী 'মুজিব চিরন্তন' উপলক্ষে বিশ্বনেতৃবৃন্দের ২৩২টি বক্তব্য ও বাণী সংকলন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রন্থটি প্রকাশ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে শুধু বাংলাদেশের জনগণই ভালোবাসতো না, বিশ্ব মঞ্চেও তাঁর অনেক বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। তিনি সারা বিশ্বে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এই বইয়ে সংকলিত বিশ্বনেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও বাণীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। বিশ্বনেতারা বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের ১১ লক্ষাধিক নাগরিককে মানবিক আশ্রয়দান, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে-কোনো সমস্যা সমাধানের মতো অর্জনগুলোর জন্য শেখ হাসিনার সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, এই গ্রন্থের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বনেতৃবৃন্দের মূল্যায়ন পরবর্তী প্রজন্মও জানতে পারবে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে মুজিব চিরন্তন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ, নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারি ও শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে প্রদত্ত ভাষণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বনেতাদের নিকট থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত ১৬৯টি বাণী, তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রেরিত ১৩টি বাণী, চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৫টি ভিডিও মেসেজের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব কর্তৃক প্রেরিত ১০টি বাণী রয়েছে। এসব ভাষণ ও বাণীতে জাতির পিতার প্রতি বিশ্বনেতৃবৃন্দের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। একইসাথে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্জনসমূহেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এ অনুষ্ঠানে এ এস এম শামসুল আরেফিন সম্পাদিত *'BANGLADESH@50'* এবং সত্যম রায় চৌধুরী সম্পাদিত *'BANGABANDHU FOR YOU'* বই দুটিরও মোড়ক উন্মোচন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সৌভিক বিশ্বাস

বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ

আমীরুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু, আমাদের চিরকালীন অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি বিশ্বনেতা। আপনি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আপনি অমর। আপনি শাশ্বত। আপনি আমাদের জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধু আপনার কর্মময় জীবন নিয়ে যখন ভাবি তখন আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয় আমাদের হৃদয়। চিরদুঃখী ভাগ্যহীন এক দেশ বাংলাদেশ। লড়াই-সংগ্রাম আর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরবময় নাগরিক। এ দেশের মহান নেতা আপনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি আপনি। নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন দেশের জন্য। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একসূত্রে গ্রথিত। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। আপনার রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস মানে বাংলাদেশের ইতিহাস অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জীবনী।

বঙ্গবন্ধু আপনি একজন মহান নেতা। আপনার আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা হাজার বছরের শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

আপনি শতাব্দীর কণ্ঠস্বর। আপনি আজীবন আপোশহীন সংগ্রামী রাজনীতিবিদ। আপনি বাংলার মানুষকে ভালোবাসতেন। তাদের যেন উন্নতি হয়, তারা যেন আনন্দে বেঁচে থাকতে পারে, তারা যেন পেট ভরে খাবার পায়, থাকার জন্য আবাস পায়, চিকিৎসার সুযোগ পায়, শিক্ষার আলো যেন ছড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে– এই ছিল আপনার স্বপ্ন। শৈশব থেকে আপনি এই স্বপ্ন লালন করেছিলেন।

সেই কৈশোরকালেই আপনি উপলব্ধি করলেন পাকিস্তান নয়, বাঙালিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রয়োজন। স্থির লক্ষ্যে আপনি কাজ শুরু করলেন। আপনার সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করলেও কোনো ভুল পাওয়া যাবে না। খুব বিচক্ষণ রাজনীতিক দ্রষ্টা ছিলেন আপনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনতে হবে– এই লক্ষ্যে আপনি কাজ করে গেছেন। পৃথিবীর সেরা রাজনীতিবিদদের অন্যতম আপনি।

১৯৪৭-এ পাকিস্তানের জন্ম। কলকাতা থেকে আপনি ফিরে এলেন ঢাকায়। ১৯৫২-তে শুরু হলো ভাষা আন্দোলন। মায়ের ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার মতো অন্যায় আর কি আছে? তখনই প্রমাণ হয় ধর্মের মিথ্যা বুলি নিয়ে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকব না। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠল।

তারপর শুরু হলো সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। দশটা বছর গোলাম বানিয়ে রাখল আইয়ুব খান।

অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। আপনার তুলনা আপনি নিজেই। জেল-জুলুম, নিপীড়ন, শোষণ– কোনো কিছুকে আপনি তোয়াক্কা করলেন না। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আপনার সংগ্রাম অব্যাহত রইল।

এই সময় আপনি ছয় দফা পেশ করলেন। বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন চাইলেন, আলাদা দেশ, আলাদা অর্থনীতি, আলাদা শাসন ব্যবস্থা থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তা মানবে কেন?

তারাও আক্রমণ করতে চাইল বঙ্গবন্ধু ও বাঙালিদের ওপর। বঙ্গবন্ধু আপনিসহ ধরপাকড় চলতে লাগল আওয়ামী লীগ নেতাদের। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন জেগে উঠেছে বাঙালিরা। সমস্ত জেল-জুলুম মাথা পেতে নিলেন। বাংলার মানুষ তখন জেগে উঠেছে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবীরা তখন বাংলার স্বাধীনতার জন্য মুখর করে তুলেছে বাংলার প্রান্তর।

বঙ্গবন্ধু আপনি তখন জেলে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনও টলে উঠল। ভিত্তি ভেঙে গেল। বাংলার মানুষ তখন আন্দোলনরত। তারা জীবন দিচ্ছে। স্লোগানে মুখর করে তুলেছে। সবার কণ্ঠে একই ধ্বনি–

জেলের তালা ভাঙবো
শেখ মুজিবকে আনবো।
তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করা হলো জেল থেকে। মিথ্যা প্রমাণিত হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

বঙ্গবন্ধু আপনি তখন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য বিধাতা। তাদের মহান নেতা।

বঙ্গবন্ধু আপনি বাঙালির নেতা। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবে রূপ নেবে– এই ছিল আপনার একমাত্র চিন্তা। কোনো ভয় আপনাকে নত করতে পারেনি। বাঙালি হিসেবে এই শক্তি ও সাহস অন্য কোনো নেতার মধ্যে দেখা যায়নি। এই শক্তি আপনি পেয়েছিলেন বাংলার মানুষের ভালোবাসা থেকে। সারা জীবন আপনি এই ভালোবাসার মূল্য দিতে চেয়েছেন।

একটি পরাধীন জাতিকে আপনি জাগ্রত করলেন। বাঙালির সামনে তুলে ধরলেন ছয় দফা। বাঙালির মুক্তিসনদ। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের সামরিক শাসন। এলো নির্বাচন। সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পাকিস্তান উপেক্ষা করল বাঙালিদের বাঁচার দাবিকে।

হে মহান বঙ্গবন্ধু, এত ষড়যন্ত্রের ভেতরেও আপনি নির্বাচনে অংশ নিলেন। মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিলেন। সত্তরের নির্বাচনে দুটি ছাড়া সকল আসনে জয়লাভ করলেন। দেশ স্বাধীন হওয়া তখন সময়ের ব্যাপার।

সংগ্রামে-আন্দোলনে-ত্যাগে-মহিমায় আপনার জীবন মহানায়কের মতো। আপনার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে কোনো কালো দাগ নাই। আপনি জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। মিথ্যাবুলি ও ধোঁকাবাজির রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

নির্বাচনে জয়লাভ করলেও ক্ষমতা আপনার হাতে হস্তান্তর করা হলো না। নানা ছলচাতুরি হতে লাগল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন আপনি। বাঙালি তার মুক্তির পথ খুঁজে পেল। ১৯৭১-এ পুরো মার্চ মাসজুড়েই ছিল অসহযোগ আন্দোলন। মিছিলে মিছিলে অগ্নিময় হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান সে দাবানল হতে আপনারাও রেহাই পাবেন না। সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করবেন না।

৭ই মার্চ। বসন্তের বিকেল। লাল সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা হাতে উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ এসেছে আপনার দিক নির্দেশনা শুনতে। আপনি মঞ্চে উঠলেন, সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি। কালো মুজিব কোট পরনে। আপনার চিরকালের চেনা পোশাক। কালো ফ্রেমের চশমাটা খুলে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে আপনি বলা শুরু করলেন সেই অসাধারণ বক্তৃতা।

'ভায়েরা আমার। আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন। সবই বোঝেন।' সেই বক্তৃতা বাঙালির ইতিহাস বদলে দিলো। সেই বক্তৃতাই আমাদের মুক্তির সনদ। সেই বক্তৃতাই আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার মূলমন্ত্র।

৭ই মার্চের ভাষণে আপনার প্রচণ্ড আবেগে কম্পমান মুখ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। খুব আত্মবিশ্বাসী আপনি। বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য আপনি তখন জীবন দিতে প্রস্তুত। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলায় অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস'।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর সেরা ভাষণের একটি। এই ভাষণ এখন পৃথিবীর ঐতিহ্য। এই ভাষণ আমাদের প্রেরণার উৎস। এই ভাষণেই আপনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বলে দিলেন।

আপনি বলেছিলেন,

> ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল' জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন। গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল। ...

সবশেষে বঙ্গবন্ধু আপনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন,

> বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।
>
> এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের এই বক্তৃতাই বাংলাদেশের মুক্তির সনদ। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা।

আজও আমরা যখন হতাশায় ভেঙে পড়ি, যখন পথের দিশা খুঁজে না পাই, তখন আপনার বক্তৃতা আমাদের প্রেরণা দেয়। আমরা জ্বলে উঠি। দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি আপনার প্রেরণায়। ৭ই মার্চের বক্তৃতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে আছে লড়াকু বাঙালি জাতির কথা। আমরা কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো– সেই স্বপ্নের কথা।

তারপর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম। তারপর ভগ্নস্তূপ দেশ গড়ার কাজ। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল আপনার। তারপর

আবার দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র। আবার ইতিহাসের কালো অধ্যায়। শোকাবহ আগস্ট মাস। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। সেই কালো রাত। সেই অন্ধকার। সেই হত্যাকাণ্ড। পুরো পরিবারসহ ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আর নেই।

স্বাধীনতার ডাক দিয়ে আপনি হয়ে উঠলেন বাংলার নয়নমণি। আপনি আপোশ করতে শেখেননি। তাই জেল-জুলুম-হুমকি আপনাকে একচুলও নড়াতে পারেনি।

আপনি বঙ্গবন্ধু। আপনি জাতির পিতা। আপনি শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বন্ধু। আপনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ নেতা। আপনি হয়ে উঠলেন ক্রমে বিশ্বনেতা।

আপনি আমাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আপনি আমাদের নির্ভরতার প্রতীক। আপনি পৃথিবীর অন্যতম নেতা। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে আপনি অসাধারণ হয়ে উঠেছেন।

১৯৭২-এ নতুন সরকার গঠিত হলো। সব নতুন করে শুরু হলো। গঠিত হলো বিমান, সড়ক ও নৌযান। মেরামত করা হলো রাস্তাঘাট। উৎপাদন বাড়ানো হলো ধান-পাটের। পশু ও মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি, স্কুল-কলেজ মেরামত, বাসস্থান নির্মাণ, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক– একযোগে চলতে লাগল। বদলে গেল পাঠ্যপুস্তক। নতুন পাঠ্যসূচিতে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় দৃঢ় হলো।

নতুনভাবে তৈরি হলো স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনী। কী অসাধারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার শক্তি। এই অল্পসময়ে তিনি যে পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ গড়ে তুললেন সেই পথেই আজও বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, চিকিৎসা সেবা, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠনসহ প্রাথমিক কাজগুলো অতিদ্রুত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করলেন আপনি। অসাধারণ কর্মদক্ষতা আপনার বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের সংবিধানও রচিত হলো আপনার তত্ত্বাবধানে। যে গণতন্ত্র আপনার চিরদিনের সাধনা ছিল সংবিধান রচিত হলো তারই প্রেক্ষাপটে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা নির্ধারিত হলো। এসব আপনি দ্রুত সমাধা করলেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের নতুন বেতন কাঠামো তৈরি হলো। নতুন দেশে উড়তে লাগল নতুন পতাকা। বছরের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো বিশেষ দিবস হিসেবে পালিত হতে লাগল। ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। পৃথিবীতে খুব কম দেশ আছে যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আমরা সেই বিরল জাতি যারা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি। তাই বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে অন্যরকম নেতা। তিনি আন্দোলন করেছেন। সংগ্রাম করেছেন। নির্বাচন করেছেন। বাঙালিদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়েছেন। স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি সংবিধান দিয়েছেন। দেশ স্বাধীন করে দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে কাজ করে গেছেন। সবই করেছেন তিনি দেশ ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা থেকে।

১৯৭৪ সালে ইসলামি সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। দেখা হয় ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে। জাপানের যুবরাজ, ভুটানের রাজা কিংবা আফগান প্রেসিডেন্ট । বাংলাদেশে আগমনে তাঁদের প্রতি ছিলেন আন্তরিক।

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেন আপনি। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহু রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। উল্লেখ করা যায় কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর কথা। কিউবাও যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ক্যাস্ত্রোর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথেও ছিল আপনার গভীর সম্পর্ক।

সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের সঙ্গে ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। বিশ্বশান্তির জন্য আপনারা একসাথে কাজ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু আপনি আমাদের চিরস্মরণীয় নেতা। আপনার সঙ্গে চীনের মহান নেতা মাও সে তুং এবং চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। চীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও বঙ্গবন্ধু কখনো কোনো মন্তব্য করেননি। বরং চীনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে ভূমিকা নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবৎকালেই মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

বঙ্গবন্ধু পরিবেশবাদী নেতা ছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের।

হে মহান নেতা, ছয় দফার সময় আপনি যে মহান কর্মসূচি গ্রহণ করেন তা যথার্থভাবে পালন করার চেষ্টা করেন। দেশে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জীবিতকালেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় নতুন একটি দেশ। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি ছিল আপনার গভীর অনুরাগ। আপনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে এসেছিলেন। পল্লিকবি জসীমউদদীন ছিলেন আপনার শ্রদ্ধাভাজন। শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলা একাডেমিকে সুসংগঠিত করেন। বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। গান ও কবিতা আপনি পছন্দ করতেন।

১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বিশ্বশান্তির জন্য জুলিও কুরি পুরস্কার পান। বঙ্গবন্ধু তখন বলেন, বিশ্বের শান্তিকামী শক্তি সংহত হোক। ১৯৭৩ সালে কানাডায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে বলেন, আমাদের শান্তির প্রতিশ্রুতি সর্বাত্মক। আমরা নির্যাতিত ও ন্যায়ের সংগ্রামের পক্ষে।

১৭ই মার্চ ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধু আপনার শেষ জন্মদিন। জন্মদিনের আড়ম্বর আপনি পছন্দ করতেন না। কেউ পালন করতে চাইলে বাধা দিতেন। শেষ জন্মদিনে আপনি ছিলেন অন্যরকম। গণভবনে সেদিন আয়োজন করা হয় শিশু-কিশোর সমাবেশের। কচিকাঁচার মেলা ও খেলাঘরের শিশুরা সেদিন কলকাকলিতে মুখর করে তোলে গণভবন। বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে ক্ষুদে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। কেক কাটেন। বেলুন ওড়ান এবং শিশুরা যা আবদার করে তা হাসিমুখে মেনে নেন।

শিশুদের প্রতি ছিল আপনার গভীর মমতা। বাংলাদেশ সরকার আপনার জন্মদিনকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। আমরা মহান নেতাকে স্মরণ করে দিনটা পালন করি। আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। হয়ত একদিন এই ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন বিশ্বব্যাপী শিশুদের উৎসব হিসেবে পালিত হবে।

আমীরুল ইসলাম: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, amirul.islam.i@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে 'মানবাধিকার দিবস-২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

মানুষের অধিকার

শ্যামল দত্ত

প্রতিটি মানুষের জন্মগত কিছু অধিকার থাকে যেমন খাদ্যের অধিকার। প্রতিটি মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। একইভাবে মানুষের বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি পাবার মৌলিক অধিকারও রয়েছে। আর এসব অধিকারই মানবাধিকার। একে মানুষের মৌলিক বা জন্মগত অধিকারও বলা যেতে পারে। মূলত মানবাধিকার বলতে মানুষের সকল অধিকার ও স্বাধীনতাকে বোঝায়। এই অধিকারগুলো নারী, পুরুষ, শ্রেণি, ভাষা, জাতি, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যে-কোনো মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আজীবন সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। এই অধিকারগুলো থেকে কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ক্ষমতার পরিবর্তে মানুষের অধিকার অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি, প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না! আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।'

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। এরপর ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, সেখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা এককথায় মানুষের মৌলিক অধিকার। স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১১ মাসের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান উপহার দেন। এই সংবিধানেও মানবাধিকারকে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কেননা সংবিধানের মূল ভিত্তিই জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এর সবই মানবাধিকারের পরিপূরক। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উল্লেখ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' এছাড়া মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেটি সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬ থেকে ৪৭-এর ক অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার তাগিদে নব্বই দশকের শেষদিকে বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। জারি করা হয় 'মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭'। তবে দেশের মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নির্দেশনায় সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করতে এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় এর সুপারিশ বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছিল। এরপর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা ভাবতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মোট ৫১টি দেশের সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি ও মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। জাতিসংঘের নির্দেশনায় বিশ্বের সকল দেশে প্রতিবছর ১০ই ডিসেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস'। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ঘোষিত হয়েছে এই সনদ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের ওপর সর্বজনীন ঘোষণার খসড়া সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৪৮ ভোট পড়ে এবং বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। কিন্তু ৮টি দেশ ভোট প্রদানে বিরত থাকে। সেই দেশগুলো হচ্ছে: সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউক্রেন, বেলারুশ, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সৌদি আরব। ১৯৫০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩১৭তম পূর্ণ অধিবেশনে ৪২৩-এর ৫নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশসহ আগ্রহী সংস্থাগুলোকে দিনটি তাদের মতো করে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়। সেই থেকে এই দিনে বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন ধারায় মানুষের অধিকারগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধারা-১

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে, সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

ধারা-২

স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে। কোনো দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোনো অধিবাসীর প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা হবে না, সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোনো সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা-৩

জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

ধারা-৪

কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাস ব্যাবসা নিষিদ্ধ করা হবে।

ধারা-৫

কাউকে নির্যাতন করা যাবে না, কিংবা কারও প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এ হেন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা-৬

আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।

ধারা-৭

আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোনো বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমানভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা-৮

শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা-৯

কাউকেই খেয়াল খুশিমতো গ্রেপ্তার বা অন্তরিন করা কিংবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

ধারা-১০

নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

এমন আরও ২০টি ধারাসহ রয়েছে মোট ৩০টি ধারা।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধীনতা ও শঙ্কামুক্ত জীবন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সনদের প্রথম ধারা, সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে, সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত। দ্বিতীয় ধারা, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে। মানবাধিকার সনদের অন্যান্য ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হচ্ছে– কাউকে দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। কাউকে নির্যাতন বা কারও প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না। আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। কাউকেই খেয়ালখুশি মতো গ্রেপ্তার করা যাবে না। নিজ রাষ্ট্রে সবারই স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার থাকবে। কাউকেই তার জাতীয়তা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থি কোনো উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করা যাবে না। কোনো রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোনো কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাৎ করতে পারে এমন কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারেন। মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই সনদের অভিভুক্ত ধারাগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আসছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় যে ১৭টি ধাপ রয়েছে, তার প্রতিটিই মানুষের অধিকার অর্জনের। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। মানবাধিকার রক্ষায় আইনের শাসন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এনএইচআরসি ইউএনডিপির সহায়তায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ, জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সিপ্পো, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবাধিকার ও নাগরিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি

বলেন, মানবাধিকার এবং নাগরিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে দেশবাসীকে জানাতে হবে। কেননা অধিকার ও দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সমাজের শ্রেণি-পেশানির্বিশেষে মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলছে অব্যাহত অভিযান। বাংলাদেশ সব সময়ই মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সমাজের নারী, শিশু, শ্রমিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার রক্ষায় অনেক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করেছে। তাই উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পাশাপাশি মানবাধিকার সমুন্নত রাখতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আশ্রিত উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা প্রসঙ্গের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে কোনো সংঘাতে না জড়িয়ে বরং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। তবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যের হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করার জন্য ইনডেমনিটি বিল পাস করা ছিল মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঘাতকদের বিচার না করে বিদেশি মিশনে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে, তাদের রাজনীতিতেও পুনর্বাসিত করা হয়েছে। অথচ স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন সরকার এই বিচার বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে তিন বছরের জন্য সদস্যপদ নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার নারী, শিশু, শ্রমিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার রক্ষায় অনেক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করেছে।

২০২০ সালে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় একটি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২-এর সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

এ উপলক্ষে এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়নকল্পে সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন করে। ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য জনবল ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বৈশ্বিক করোনাভাইরাসকালে মানবাধিকার দিবস পালনের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বলেন, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গোটা বিশ্ব বিপর্যস্ত। করোনা মোকাবিলার সকল প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দু মানবাধিকার সুরক্ষা। আর এই প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goal বা MDG) ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal বা SDG) ঘোষণা করেছে। এই লক্ষ্যগুলো হচ্ছে– ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। SDG-এর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG-এর গুরুত্বপূর্ণ ১৭টি লক্ষ্য হচ্ছে– (১) দারিদ্র্য বিমোচন, (২) ক্ষুধা মুক্তি, (৩) সুস্বাস্থ্য, (৪) মানসম্মত শিক্ষা, (৫) লিঙ্গ সমতা, (৬) সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, (৭) নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানি, (৮) কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, (৯) উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, (১০) বৈষম্য হ্রাস, (১১) টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, (১২) সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, (১৩) জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ, (১৪) টেকসই মহাসাগর, (১৫) ভূমির টেকসই ব্যবহার, (১৬) শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং (১৭) টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

জাতিসংঘ ঘোষিত এই লক্ষ্যগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানবাধিকার সুরক্ষা করা বা নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাপী মানুষের কল্যাণে এই লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে কোনো বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়নি। এমনকি নারী-পুরুষের বৈষম্যও করা হয়নি। বরং এই লক্ষ্যগুলো নির্ধারিত হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goal বা MDG)-এর বেশ কয়েকটি ধাপ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছে। জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পুরস্কার অর্জন করেন। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক এসডিএসএন প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিশ্বের সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পুরস্কারটি বাংলাদেশের জনগণকে উৎসর্গ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন অব দ্য ডে' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনাভাইরাস চলাকালেও এসডিজি প্রচারণা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সংগ্রামকেই সমুন্নত করার প্রচেষ্টায় কাজ করছেন। কেবল সরকার নয়, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সর্বসাধারণের। এভাবেই সমাজের সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মানুষের ন্যায়বিচার লাভের অধিকার সুসংহত হলে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' আর কখনও কাঁদবে না। আর কেবল তখনই সার্থক হবে বিশ্ব মানবাধিকার পালনের সকল আয়োজন।

শ্যামল দত্ত: লেখক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, dutta209@gmail.com

বঙ্গবন্ধুর ধর্মাচরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতা

রহিম আব্দুর রহিম

ধর্মনিরপেক্ষতার অমূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার মহামানব এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনিই স্থাপন করেন ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিশালী স্তম্ভ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন এবং চর্চা করতেন, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহর ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। আবার ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। '১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামী লীগ এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে পবিত্র কোরান সুন্নাহর সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশনাবলির পরিপন্থি কোনো আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না। সন্নিবেশিত হবে– সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' (বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, 'বঙ্গবন্ধুর ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা', ১০ই অক্টোবর ২০২০, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*)

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন' শিরোনামে সৈয়দ বদরুল আহসান এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন, যে জাতিকে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে তারা এক বাংলাদেশের অংশ এবং ঐতিহাসিকভাবে এখানে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। তিনি জেনেছেন, বাঙালি হলো বাংলার হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে সকল সম্প্রদায়, সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির মেলবন্ধন। এই অসাম্প্রদায়িকতার বাহনে করে গণতন্ত্র বাংলাদেশকে তার রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনা এবং নাগরিককে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে চালিত করবে। সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা নাগরিকদের জীবন সাধনার একমাত্র পাথেয়।'

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদন উপলক্ষে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার– এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলবো সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।' বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার মাঝেই সকল বাঙালির শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো-কোটি মানুষের সামনে বলেন, 'বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ...পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সেনা বাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।'

বঙ্গবন্ধুর এ ধরনের ভাষণই প্রমাণ করে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্য কোনো ধর্মকে আঘাত করা কিংবা অন্যের ধর্ম পালনে বাধা দান নয়, বরং যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে, এতে সকল ধর্মের মানুষরা একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাদর্শে লালিত-পালিত হবে এবং

সকল মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে।

বঙ্গবন্ধু প্রজ্বলিত ধর্মপ্রাণের নিদর্শন প্রকাশ পায় তাঁর জন্ম ইতিহাসে। তিনি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধুর ইসলামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্মরণীয়। পারিবারিকভাবেই তাঁদের মধ্যে ইসলাম চর্চা ছিল। তিনি সর্বদাই চেয়েছেন ইসলাম অনুযায়ী মুসলিমসমাজে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্ম বাণীর প্রচার এবং প্রসার হোক। ইসলামকে রাজনীতিতে এনে কেউ যেন ইসলামের অপব্যবহার বা অপবিত্র না করেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি চেয়েছিলেন– ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায়বিচারের মতো মৌলিক আদর্শের প্রচার এবং প্রসার।

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রারম্ভে রেডিওতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন, '... আমরা লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসুলে করীম (সা.)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বার বার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে।'

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে বিশ্ববাসীকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, 'বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। এই নীতির মূলকথা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের সঙ্গে মৈত্রী।' ১৯৭৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর মূল্যবান ভাষণে বলেন, 'আরব ভাইদের ওপর যে নিদারুণ অবিচার হয়েছে, অবশ্যই তার অবসান ঘটাতে হবে। অন্যায়ভাবে দখলকৃত আরবভূমি অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে। ... আমাদের সম্পদ ও শক্তি এমনভাবে সুসংহত করতে হবে যাতে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়।'

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, 'এক শ্রেণির লোক নির্বাচনের সময় ইসলাম গেল, ইসলাম গেল বলে চিৎকার করেছেন। ... এদেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই থাকবে।' ১৯৭২ সালের ৩রা জুলাই কুষ্টিয়ার এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর দেওয়া ভাষণে বলেন, 'ধর্মের নামে আলবদর, আলশামসদের ব্যাবসা করতে বাংলার জনসাধারণ দিবে না। আর আমিও দিতে পারব না, কারণ এই ধর্মের নামে পশ্চিমারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে।' তাঁর উক্তিগুলোতে প্রমাণিত, মুজিব ছিলেন ইসলামের মৌলিক গবেষক; কোনো প্রকার লেবাসধারী ইসলাম পালনকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। পক্ষান্তরে বঙ্গবন্ধু অন্তরে লালন করতেন আল্লাহতায়ালাকে। কথায়, কাজে, বক্তৃতা, বিবৃতির শুরুতেই তিনি আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করতেন। তিনি যে খোদাভক্ত একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সমাবেশ, সেমিনার, মিটিংয়ে দেওয়া ভাষণের শুরুতে ও শেষে।

১৯৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর জাতীয় রক্ষীবাহিনীর শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণ শুরু করেছিলেন, '... আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি, মৃত্যু মানুষের একবারই হবে, দুইবার হয় না।' ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রেডক্রিসেন্ট কর্মীদের সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'আল্লাহর বিশেষ রহমতে সকলের দোয়ায় টাইফুন ঝড় বাংলাদেশে হয় নাই ...। আল্লাহ আমাদেরকে রহম করেছে, সেজন্য আল্লাহর কাছে আপনারা আত্মরক্ষার্থে মোনাজাত করবেন। রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন।'

১৯৭৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরের এক জনসভায় তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে আবার আসব। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ইমানের সঙ্গে রাখে।' ১৯৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাকেরগঞ্জের এক সভায় বলেন, 'আপনারা আমাকে দোয়া করেছেন, মা-বোনেরা রোজা রেখেছে, মসজিদে-মন্দিরে দোয়া হয়েছে। আমি জেলখানা থেকে কবর থেকে ফিরা আসছি।' ১৯৭৫ সালের ১৫ই জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বলেন, 'জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী– এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েকগজ কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিয়ে যাব না।'

১৯৭০-এর নির্বাচনের এক আবেদনে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, 'ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।' ১৯৭২-এর ২৬শে মার্চ ঢাকার আজিমপুরে এক ভাষণে বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারী যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, বাংলার স্বাধীনতা হরণ করার শক্তি তাদের নাই; ইনশাআল্লাহ আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।' ১৯৭২-এর ৯ই মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে।' ১৯৭২-এর মে মাসে পাবনার জনসভায় বলেন, 'মানুষকে সাহায্য করতে হবে। বিজয় নিশ্চিত বন্ধুরা। আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।' ১৯৭২-এর ৭ই জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শ্রমিকদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'শ্রমিক ভাইয়েরা, আল্লাহর ওয়াস্তে উৎপাদন করো। আল্লাহর ওয়াস্তে মিল খেয়ে ফেলো না। আমি এবার তাহলে চলি। খোদা হাফেজ।' ১৯৭২-এর ৩রা জুলাই

কুষ্টিয়ার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ইনশাআল্লাহ যদি আপনারা তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করেন তাহলে বাংলার মানুষ আশা করি পেট ভরে ভাত খাবে। ... আপনারা আমার সাথে দোয়া করেন যে সমস্ত লোক, আমার ভাইয়েরা শহিদ হয়েছে এই যুদ্ধে, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আপনারা মোনাজাত করেন আমার সাথে। আল্লাহু আকবার।' ১৯৭২-এর ৪ঠা জুলাই কুমিল্লার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আর যে সমস্ত ভাই, যে সমস্ত বোন, যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে তাঁদের মাগফেরাত কামনা করে আমার সাথে দোয়া করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ... বহুক্ষণ আপনারা কষ্ট করেছেন। ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকলে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ইমানের সাথে রাখে, আর আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি।' ১৯৭২-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের বলেন, 'তবুও যাদের দোয়ায় আমি ফিরে এসেছি এবং আল্লাহ যেন তৌফিক দেন তাদের সাথে যেন মরতে পারি।' ১৯৭৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের এক জনসভায় বলেন, 'তবে একটা কথা হলো এই আপনারা আমাকে দোয়া করেন। আল্লাহ যেন ইমানের সঙ্গে রাখেন।'

জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা যদি বাংলার সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলি-বণ্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কলকারখানায়, ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বাড়াতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের ভাবী বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারব।' ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ জাতীয় সংসদে বাকশালের নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> আমরা অগ্রসর হই। বিসমিল্লাহ বলে। আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাআল্লাহ, আমরা কামিয়াব হব। খোদা আমাদের সহায় আছেন। ... সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির নাজির করে, নিজের আত্মসমালোচনা করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে কাজে অগ্রসর হন। বাংলার জনগণ আপনার সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে; জনগণকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাআল্লাহ। আমি কামিয়াব হবই।

১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তবু আসছি, কারণ বহুদিন আপনাদের সাথে দেখা হয় না। আপনারা আমাকে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন ভালো রাখে'।

বঙ্গবন্ধুর নিজ ধর্ম পালন সম্পর্কে জানা যায় তাঁর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ১৮০ পৃষ্ঠায়। যেখানে তিনি উল্লেখ করেন–

> আমি তখন নামাজ পড়তাম এবং কোরআন তেলওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর তরজমাও পড়েছি।

খোদাভক্ত ইসলামপ্রেমী বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসলামী ফাউন্ডেশন', 'বাংলাদেশ সীরাত মজলিশ'; ক্রয় করেন হজযাত্রীদের জন্য জাহাজ। পুনর্গঠন করেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, শুরু করেন বেতার ও টিভিতে কোরান তেলাওয়াত; ঘোষণা করেন পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবি (সা.), শবে কদর, শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি। মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপসহ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা আইন করে নিষিদ্ধ করেন। তিনিই বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে জমি এবং কাকরাইলের মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ দেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাশিয়াতে তাবলীগ-জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষে সমর্থনে সাহায্য প্রেরণ করেন। বঙ্গবন্ধুই ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুই সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিবর্তে শরিয়তভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১৯৭৪ সালে আইডিবি চার্টার-এ স্বাক্ষর করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন খোদাভক্ত, ইসলাম দরদি, ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনের এক মহানায়ক, প্রাণপুরুষ; তবে তিনি ছিলেন ধর্মব্যবসায়ীদের ঘোরবিরোধী এক ইস্পাত কঠিন প্রাচীরসম।

রহিম আব্দুর রহিম: শিশুসংগঠক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গলেহাহাট ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, পঞ্চগড়, bskt1967@gmail.com

অনলাইনে জলমহাল ইজারা আবেদন

ভূমি মন্ত্রণালয় অনলাইনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিলের সুবিধা চালু করেছে। ১৫ই নভেম্বর এ সংক্রান্ত এক পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। land.gov.bd ভূমিসেবা কাঠামো থেকে অথবা সরাসরি jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করা যাবে। উল্লেখ্য, জলমহাল ইজারার আবেদন অনলাইনে দাখিল এবং ইজারা প্রক্রিয়ার বিস্তারিত উক্ত ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে, সাধারণ আবেদনে জেলা ও উপজেলায় আবেদন দাখিল করে। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বিদ্যমান পদ্ধতিতে আবেদন দাখিল করায় আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিল না করা হলে বাছাইকালে আবেদন বাতিল করা হয়। বাতিলকৃত আবেদনের বিষয়ে আবেদনকারী সমিতি কর্তৃক কাগজ দাখিল করেছে মর্মে অভিযোগ দায়ের করে পরবর্তীতে আবেদন বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

পরিপত্রে আরও বলা হয়, জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা, একাধিক সমিতির আবেদন দাখিলে নানাবিধ জটিলতার উদ্ভব ঘটছে। উল্লেখ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদক্ষেপ হিসেবে সায়রাত মহালসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অনলাইনে ডাটাবেজ (ভূমি তথ্য ব্যাংক) তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে ই-নামজারিসহ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। জলমহাল ইজারার আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া অনলাইনে চালু হলে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিলসহ ইজারা প্রক্রিয়ার জটিলতা নিরসন সম্ভব হবে।

প্রতিবেদন: জিনিয়া রহমান

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যা

কে সি বি তপু

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। বাঙালি বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞের শিকার হন। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে এদেশীয় একশ্রেণির দালালরা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য ও নেতৃত্বহীন করার হীন চক্রান্তে এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। বুদ্ধিজীবীরা জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার কাজে বরাবরই ছিলেন তৎপর এবং তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। এ কারণে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই ছিলেন পাকিস্তানি শাসকদের বিরাগভাজন। বাঙালি জাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়ায় পরিণত করার লক্ষ্যে চলে এ নীলনকশার বাস্তবায়ন। তবে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার হীনচক্রান্তে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। এই পরিকল্পিত গণহত্যাটি বাংলাদেশের ইতিহাসে 'বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। বন্দি অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের দেশের বিভিন্ন বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত লাশ রায়েরবাজার এবং মিরপুর বধ্যভূমিসহ দেশের বিভিন্ন বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। অনেকের লাশ শনাক্তও করা যায়নি, পাওয়াও যায়নি বহু লাশ। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে পালিত হয় 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'। বুদ্ধিজীবী হত্যার স্মরণে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে একটি স্মারক ডাকটিকিটের সিরিজ বের করেছে।

যে-কোনো দেশে চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে অগ্রসর শ্রেণি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। কোনো কোনো মনীষী মনে করেন, একটি মানুষের দেহের জন্য মস্তিষ্কের যেমন গুরুত্ব, সমাজের জন্য বুদ্ধিজীবীগণ তেমনি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। তাঁরাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সাধারণ অর্থে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী– যাঁরা বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। বাংলা একাডেমি প্রণীত *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ* অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী অর্থ– 'লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী'।

বাঙালি জাতিকে পদানত, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার নানা আয়োজনে ভরপুর ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনকাল। এই আয়োজনে ধর্ম হয়েছিল তাদের ঢাল ও তলোয়ার। অন্যদিকে এর বিপরীত ধারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বাঙালি সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক চর্চা অপরিহার্য। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বুদ্ধিজীবীগণ। বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণ একদিকে বিকশিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণে, অন্যদিকে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বা আত্মাকে ক্ষুরধার করেছিল অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতো বুদ্ধিজীবীরাও। রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী-সমাজের বৌদ্ধিক প্রেরণায় শাণিত হতে থাকে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন। রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি বাঙালিকে সাংস্কৃতিক চেতনায় জাগ্রত রাখার পশ্চাতে বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণাই ছিল সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে যথার্থ ভূমিকাই রেখেছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যেসব বুদ্ধিজীবী জড়িত ছিলেন তাঁরাও যেমন মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে জড়িত ছিলেন না, তাঁরাও এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা শুধু যুদ্ধের নয় মাসেই সীমিত ছিল না। ব্রিটিশ আমলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে এরা ছিলেন অনুপ্রেরণাদানকারী, কেউ কেউ সামনের কাতারে। বাঙালি জাতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, অত্যাচারের বিষয় সাধারণ মানুষকে অবগত করেছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশ থেকে

বিপুল পরিমাণ সম্পদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এটা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সেই সত্যটা আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তাঁরাই প্রথম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি স্বতন্ত্র অর্থনীতি চালুর কথা বলেছেন। বাঙালি সাংবাদিকরা তুলে ধরেছেন আন্দোলনের প্রতিটি খবর, শিল্পী-সাহিত্যিকরা গল্প, উপন্যাস, নাটক, গানসহ লেখনীর মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রতি সচেতন করে তুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কখনো স্বতন্ত্র, কখনো একসঙ্গে করেছেন আন্দোলন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন বুদ্ধিজীবীরা।

শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থে বলা হয়েছে, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাঁদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমের মাধ্যমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়ে পাঠদানে, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নির্বীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেওয়া। ২৫শে মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিকে স্থায়ীভাবে পরাধীন রেখে শোষণ অব্যাহত রাখা। সারা দেশে বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযানের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুযায়ী একযোগে গণহত্যা পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযানকে ৩ পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলে। প্রথম পর্বে হত্যার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনীতিবিদ। তাঁরা শহিদ হন প্রধানত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় পর্ব চলে মে-নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এ পর্বে প্রকাশ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড কম হলেও গোপনে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবী নিধন চলে। বুদ্ধিজীবীদের তালিকা গণ-আন্দোলনের সময়ই প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ পর্বে তাঁদের হত্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজাকারদের উদ্ধারকৃত ডায়েরি থেকে বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বাঙালিকে পঙ্গু করাই ছিল হত্যার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত পর্ব ছিল ১০ই ডিসেম্বর থেকে চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত। হানাদাররা পরাভূত হবে কিংবা মাত্র ৯ মাসের মধ্যে তাদের ভরাডুবি হবে একথা কল্পনাও করেনি। সেজন্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলেও বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথ আক্রমণের মুখেও তাদের টনক নড়েনি। কারণ তখনো মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আগমন তাদের শেষ ভরসা ছিল। কিন্তু জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেলে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় ১০ই ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবী অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড দ্রুত ঘটানো হয়। ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর হাউসে বোমাবর্ষণের পর ডা. মল্লিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর পাকবাহিনীর সকল আশা ধূলিসাৎ হলে ইতোমধ্যে আটককৃত কিংবা নতুন আটককৃত বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হত্যা করা হয়। ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের মিরপুর শিয়ালবাড়ি ও মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে আরো অনেক বধ্যভূমিতে তাঁদের লাশ পাওয়া যায়। আবার কারো কারো লাশও পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার পর লাশের স্তূপে যাঁদের পাওয়া গিয়েছে তাঁদের সকলের হাত-পা-চোখ বাঁধা ছিল। কারো হাত নেই, কারো চোখ বা হৃৎপিণ্ড নেই। এগুলো নরপিশাচদের নির্যাতনের স্বাক্ষর বহন করে। (প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড', *সচিত্র বাংলাদেশ*, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১২)

ঢাকায় নিরীহ জনগণের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সময় থেকেই শুরু হয় বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অপারেশন সার্চলাইট কর্মসূচির আওতায় চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে বের করে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে ২৫শে মার্চ রাতেই হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে নির্বিচারে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ করে। শেষ আঘাতটি আসে যখন বাংলাদেশের মাটিতে তারা চূড়ান্ত পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। এই হত্যা অভিযানটি মূলত পরিচালিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের তিনদিন আগে। পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত পরিণতি আসে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১, যে দিন তারা একমাত্র ঢাকা নগরীতেই দুইশোরও বেশি বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নিষ্ঠুর পন্থায় হত্যা করে। ঢাকায় এ হত্যাকাণ্ড শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে, বিশেষত জেলা ও মহকুমা শহরে সম্প্রসারিত হয়। কেননা তারা স্পষ্ট দেখে– চরম বিপর্যয় আসন্ন, পরাজয় একেবারেই সন্নিকটে– তখনই তারা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তৎপরতা আরও জোরদার করে।

হত্যা মিশনে নিযুক্ত অস্ত্রধারীরা গেস্টাপো কায়দায় তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে তুলে আনে, তাদের চোখ বাঁধে, তারপর ঢাকার মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, মিরপুর, রাজারবাগের বিভিন্ন টর্চার সেলে নিয়ে যায়। কারফিউ বহাল থাকায় লোকজন ঘরের বাইরে থাকে না বলে সুবিধে হয় হত্যাকারীদের।

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, গুলি করে এসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় এবং রায়েরবাজার, মিরপুরের আলোকদি, কালাপানি, রাইনখোলা ইত্যাদি জায়গায় লাশ ফেলে রাখা হয়। ১৬ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী যখন ঢাকা শহরে প্রবেশ করে তখন তারা এদের লাশ দেখতে পায় বিভিন্ন নালা-ডোবায়। এদের প্রায় প্রত্যেকের হাত ও চোখ বাঁধা, শরীরের বিভিন্ন অংশে বেয়নেটের নির্বিচার আঘাতের চিহ্ন। এদের অনেককে শনাক্ত করা যায়নি। ঢাকা বা অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরই কেবল নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই অগণিত বধ্যভূমি আছে, যেখানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু আদর্শচ্যুত হননি। বাংলাদেশের জন্মে এদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রখ্যাত লেখক ও কীর্তিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হানকে হত্যা করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি তাঁর ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে মিরপুরে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসতে পারেননি।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ বাংলাদেশের সর্বত্র সংঘটিত হয়। এ যজ্ঞে শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, রাজনৈতিক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কেউ বাদ পড়েননি। যদিও স্বাধীনতার পর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে করা হয়নি। তাই তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় না। তবে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় *বাংলাদেশ* নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে। এতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে। তালিকায় মোট ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদসহ মোট ১,১০৯ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী মোট ৬৩৯ জন প্রাথমিক, ২৭০ জন মাধ্যমিক, ৫৯ জন কলেজ, ২১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদ শহিদ হন। এছাড়া ৪১ জন আইনজীবী, ৫০ জন চিকিৎসক, ১৩ জন সাংবাদিক, ১৬ জন কবি-সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা শহিদ হন। তদুপরি এ তালিকায় রয়েছে ৮ জন শহিদ গণপরিষদ সদস্যের নাম। এই তথ্যের কাছাকাছি *বাংলাপিডিয়ার* তথ্য। *বাংলাপিডিয়ার* বর্ণনা মতে, প্রাপ্ত তথ্যসূত্র থেকে শহিদদের মোটামুটি একটা সংখ্যা দাঁড় করানো যায়। এদের মধ্যে ছিলেন ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী, ৯ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী, ৫ জন প্রকৌশলী ও অন্যান্য ২ জনসহ মোট ১,১১১ জন।

পরবর্তীকালে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের ফলে আরও অনেক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নাম পাওয়া যায়। *মুক্তিযুদ্ধে শহিদ আইনজীবী* গ্রন্থে ৬৪ জন শহিদ আইনজীবীর তালিকা রয়েছে। সরকার প্রাথমিকভাবে এক হাজার ২২২ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা অনুমোদন করেছে। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নে গঠিত কমিটির প্রথম সভায় এ তালিকা অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৩ই ডিসেম্বর ২০২০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সভা শেষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আনোয়ার পাশা, ড. আবুল খায়ের, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, অধ্যাপক রাশেদুল হাসান, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমেদ, ড. সন্তোস চন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. সিরাজুল হক খান ও অধ্যাপক সায়েদুল হাসান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার, অধ্যাপক মীর আব্দুল কাইয়ুম। এছাড়াও আছেন– ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী, ডা. আব্দুল আলীম চৌধুরী, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজামুদ্দীন আহমদ, সেলিনা পারভীন, আলতাফ মাহমুদ, জহির রায়হান এবং রনদাপ্রসাদ সাহা প্রমুখ।

বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত 'বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' নামের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করেছে, যাতে প্রথমে দেশের ১৭৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জানা যায় যে, বুদ্ধিজীবী নিধনের নীলনকশা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে অন্যূন ১০ জনের একটি কমিটি কর্তৃক প্রণীত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গভর্নর হাউজে ফেলে যাওয়া রাও ফরমান আলীর ডায়েরির পাতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা পাওয়া যায়, যাঁদের অধিকাংশই ১৪ই ডিসেম্বর নিহত হন। পাকিস্তানি বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজির সার্বিক নির্দেশনায় নীলনকশা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার বশির, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেজাজী, মেজর জহুর, মেজর আসলাম, ক্যাপ্টেন নাসির ও ক্যাপ্টেন কাইউম।

চরম ডানপন্থি ইসলামি আধাসামরিক আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডাররা পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র সাহায্য নিয়ে তাদেরই ছত্রছায়ায় এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, একাত্তরে ত্রিশ লাখ শহিদদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁরা শহিদ হন এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী নিধনের এই পরিকল্পনা করে।

বাংলাদেশে ১৪ই ডিসেম্বর শোকাবহ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আমরা সকলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখায় ব্রতী হবো এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশের উন্নয়নে ব্যাপৃত হবো। একইসঙ্গে প্রত্যাশা করি, সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্মৃতিময় সকল স্থাপনা যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রচারে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণই হোক স্বাধীনতা দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কে সি বি তপু : প্রাবন্ধিক ও গবেষক, kcbtopu@gmail.com

মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু

শহিদুল ইসলাম

বাঙালি জাতি দীর্ঘ সংগ্রাম পাড়ি দিয়ে বর্তমানে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্থিতিশীল জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর বাঙালি জাতি অত্যাচার, নির্যাতন, বৈষম্য থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং যাঁর ডাকে বাংলার মানুষ মুক্তির সনদ হাতে পেয়েছে, সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি গ্রামীণ সাধারণ জনপদে বেড়ে ওঠা দামাল ছেলে খোকা। এই খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু হওয়ার পেছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আজীবন ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রাম করে গেছেন। মানুষের মুক্তি ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অবশেষে নানা ঘাত, প্রতিঘাত ও নির্যাতনের পর বাংলার মানুষ মুক্তি পায়। বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার ফুল, বাংলার ফল, বাংলার মাটি, বাংলার জল– তাঁর কাছে ঋণী। জাতি গঠন ও নেতৃত্বদানে ছিল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। পাকিস্তানের স্বৈরশাসন সহ্য করতে পারেননি বলে তিনি বাঙালি জাতিকে একত্রিত করে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও শাসক শ্রেণির কাছে নতি স্বীকার করেননি। বাঙালি বীরের জাতি। এটা প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনাদর্শ ও সংগ্রামের কাহিনিতে।

বাঙালির রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন মানবদরদি। গরিবদুখির মুখে হাসি ফোটাতে পারলে তাঁর আত্মা শান্তি পেত। তিনি বাস্তব জীবনে তার সাক্ষ্য রাখেন। তিনি যদি দেখতেন কোনো ছেলে ভীষণ গরিব, টাকার অভাবে ছাতা কিনতে পারে না, রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে– অমনি তাঁর ছাতাটি দিয়ে দিতেন। কিংবা টাকার অভাবে কোনো ছেলে বইপত্র কিনতে পারছে না– এমন দেখলে দিয়ে দিতেন নিজের বইপত্র। ...[১]

বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা জাতি ফিরে পায় দিক নির্দেশনা। তিনি বাঙালি জাতির বন্দিত্বের নাগপাস থেকে মুক্তির নিমিত্তে বাংলার আকাশে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন। আইয়ুব খান এবং ইয়াহিয়া খানের মতো সামরিক জান্তারা সাত কোটি বাঙালিকে ভয় পেতেন না। ভয় পেতেন তাদের নেতা মুজিবকে। বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বলেছিলেন, 'I am not afraid of an army of lions led by a sheep, I am afraid of an army of sheep led by a lion.'[২]

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার আন্দোলন– সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব প্রাতঃস্মরণীয়। বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্র গ্রেপ্তার হন।

বঙ্গবন্ধু জাতির বৃহৎ স্বার্থে আন্দোলন করেছেন এবং বার বার গ্রেপ্তার হয়েছেন। কারাগার থেকেই তাঁর দিক নির্দেশনায় আন্দোলন জোরদার হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদরা। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই রক্তমাখা গৌরবের সুর বাংলাদেশের সম্মান ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত। ইউনেসকো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বের সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট, ১৯৫৬-এর সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৮-এর আগরতলা মামলা, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন– সর্বক্ষেত্রে তিনি অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধু আন্দোলন করেননি বরং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিপতি হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলেছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করে তুলেছেন। এ ব্যাপারে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর গবেষণার কথা উল্লেখ্য। কৌশিক বসুর মতে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অর্জন ও সম্ভাবনাগুলোকে বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশের এমন সাফল্যের একটি প্রধানতম কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, তাঁর মতে, বাংলাদেশেই সরকার জাতীয় অগ্রযাত্রায় দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থাৎ এনজিওগুলোকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সামাজিক পরিবর্তনে তারা সরকারের পরিপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেরেছে কার্যকরভাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিগত এক দশকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে সেটিও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে, বিশেষ অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি মনে করেন। তৃতীয়ত, কৌশিক বসু মনে করেন যে, বাংলাদেশের তুলনামূলক তরুণ জনশক্তি এবং সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধানতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।[৩]

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতিকে বঙ্গবন্ধু সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতি এবং দর্শন বাঙালি জাতিকে দিয়েছে প্রাণ। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিশ্বের অপর প্রান্তের আরেক অবিসংবাদিত নেতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে

দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বে মানুষটি হিমালয় সম।'[৪]

বিখ্যাত সাংবাদিক সিরিলডান একবার বলেন, In the thousand years history of Bangladesh, Sheikh Mujib is the only leader who has, in terms of blood, race, language, culture and birth, been a full blooded Bangali. His physical stature was immense. His voice was redolent of thunder. His charisma worked magic on people. The courage and charm that flowed from him made him a unique superman in these times. [৫]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

বাঙালির রাখাল রাজা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু সামরিক জান্তার তাক করা বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছেন এবং নিরলসভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। তাঁকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। তিনি ৪৬৮২ দিন কারা ভোগ করেছেন। ৫৫ বছরের জীবনের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় কারাগারেই কাটাতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। তাঁকে দুইবার হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর একদিন পর *দি ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস* লিখেছিল– এই করুণ মৃত্যুই যদি মুজিবের ভাগ্যে অবধারিত ছিল তা হলে বাংলাদেশ জন্মের মোটেই প্রয়োজন ছিল না।[৬]

১৯৭৫ সালের ২৮শে আগস্ট লন্ডনে *দি লিসনার* পত্রিকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল– বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে উচ্চতর আসনেই অবস্থান করবেন। তাঁর বুলেট বিক্ষত বাসগৃহটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক চিহ্ন এবং কবরস্থানটি পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে।[৭]

আমেরিকান ঔপন্যাসিক Earest Hemingway-এর উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, Man is not made for defeat. Man can be destroyed. But not defeated.[৮]

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্যারিসের বিখ্যাত *লা মঁদে (Le Monde)* পত্রিকা লিখেছিল– 'বড়ো নেতা সেই যে সময়ের সাথে সাথে আরও বড়ো হতে থাকে। তাঁকে হত্যা করে মানুষের মন থেকে নির্বাসন করা যায় না। সে প্রতিবার ফিরে আসে। সদ্য প্রয়াত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই মাপের নেতা।'[৯]

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি আমলে শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিকামী বাঙালি স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে ওঠে তাঁর নেতৃত্বে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ও অগণিত মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীনতার সুরুজ উদিত হয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকারের সফলতাসমূহ– ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তন, অস্ত্র সমর্পণ, জাতি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ, জাতীয়করণ নীতির প্রবর্তন, সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান, জোট নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাংলাদেশি মুদ্রা প্রচলন, বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ, শিক্ষা সংস্কার, ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, কমনওয়েলথ, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ প্রভৃতি।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু গণভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা শ্রদ্ধাসহকারে টানিয়ে রেখেছিলেন। সেই কবিতাটি দিয়েই নিবন্ধের ইতি টানছি–

অবসান হল রাতি
নিবাইয়া ফেল কালিমা মলিন
ঘরের কোনের বাতি।।
নিখিলের আলো পূর্ব আকাশে জ্বলিল পুণ্যদিনে।
এক সাথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক চিনে।[১০]

তথ্যসূত্র

১) *কারিগর*, সম্পাদক এ কে এম এ হামিদ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০, পৃ.১৫

২) *আমার বঙ্গবন্ধু প্রেম ও প্রেরণায়*, সম্পাদনা নাজমুল হুদা, বাঙালি, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৭১

৩) *সচিত্র বাংলাদেশ*, জুলাই ২০২১, পৃ.৭

৪) প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, 'বিশ্ব পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধু', *বিজয় সুধা*, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১

৫) প্রাগুক্ত, *বিজয় সুধা*, পৃ. ১১

৬) আবদুল বাছির, *বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০২০, পৃ.৭৮

৭) *বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, পৃ. ৭৯

৮) *বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, পৃ. ৭৯

৯) *বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, পৃ. ৭৯

১০) মোবারক সোহেন সংকলিত ও সম্পাদিত, *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৬৩-১৯৭৬), ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৭২।

শহিদুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক ও প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, সরকারি ইস্পাহানী কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, shahidulislamiuc@gmail.com

নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা বেগম রোকেয়া

ইমরান পরশ

যখন চার দেয়ালের বাইরে বিচরণ তো দূরের কথা ঘরের ভেতরই বন্দি ছিল নারী, বাইরের জগৎ ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ, সেই অবরুদ্ধ জীবন থেকে নারী মুক্তির পথ খুঁজেছে, আর সেই পথের দিশা দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। আজ নারী ঘরে-বাইরে সবখানে অবদান রেখে চলেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধী দলের নেতা, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী তার অবদান রেখে চলেছেন। নারী এখন অনেক অগ্রগামী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্বের গুণে বিশ্বের অন্যতম নেতা হিসেবে সম্মানীত হয়েছেন। নারীর এই পথপ্রদর্শক, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। তাঁর মাতা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী।

বেগম রোকেয়ার জন্মলগ্নে মুসলমানসমাজ ছিল নানাবিধ কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাঁর পরিবারে পর্দা প্রথার এতই কড়াকড়ি ছিল যে, আত্মীয় পুরুষ তো দূরের কথা বহিরাগত মহিলাদের সামনেও পরিবারের মেয়েদের পর্দা করতে হতো। নারী শিক্ষার সুযোগ বলতে ছিল শুধু কোরান তেলাওয়াত শিক্ষা ও উর্দু শিক্ষা। বাংলা বর্ণ পরিচয় ছিল নিষিদ্ধ। স্কুল-কলেজের আঙিনায় পা বাড়ানোর সৌভাগ্য বেগম রোকেয়ার হয়নি। তবে রোকেয়ার বড়ো ভাই ইব্রাহীম সাবের আধুনিক মনস্ক ছিলেন। তিনি রোকেয়া ও করিমুননেসাকে ঘরেই গোপনে বাংলা ও ইংরেজি শেখাতেন। কুসংস্কার আর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। আর সেই সংগ্রামে তিনি জয়ী হয়েছেন। তাঁর সেই সংগ্রামের পথ বেয়ে আজ নারীরা স্বপ্ন দেখেন এগিয়ে যাওয়ার।

১৮৯৬ সালে ১৬ বছর বয়সে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বেগম রোকেয়া। বিয়ের পর তিনি 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' নামে পরিচিত হন। তাঁর স্বামী মুক্তমনা মানুষ ছিলেন, রোকেয়াকে তিনি লেখালেখি করতে উৎসাহ দেন। স্বামীর উৎসাহ ও প্রেরণায় বাংলা ও ইংরেজি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন এবং একটি স্কুল তৈরির জন্য অর্থ আলাদা করে রাখেন। রোকেয়া সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামে একটি বাংলা গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যজগতে পদার্পণ করেন।

তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা *Sultana's Dream*। যার অনূদিত রূপের নাম *সুলতানার স্বপ্ন*। এটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো– *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *মতিচুর*। তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর লিঙ্গসমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। হাস্যরস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনা দিয়ে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ করতে চেয়েছেন, শিক্ষা আর পছন্দানুযায়ী পেশা নির্বাচনের সুযোগ ছাড়া যে নারীর মুক্তি আসবে না– তাও জানান।

১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। অল্প বয়সেই স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় বেগম রোকেয়া সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। এর পাঁচ মাস পর রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ভাগলপুরে। ১৯১০ সালে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার ফলে স্কুল বন্ধ করে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে ১৯১১ সালের ১৫ই মার্চ তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পুনরায় চালু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় ছাত্রী ছিল আট জন। চার বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪-তে। ১৯৩০ সালের মাঝে এটি হাই স্কুলে পরিণত হয়। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেগম রোকেয়া নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সভায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

তিনি বুঝেছিলেন, সমাজে নারীর উন্নয়নের জন্য প্রথমে দরকার কন্যাশিশুদের উন্নয়ন। বেগম রোকেয়ার প্রতিটা লেখালেখিতে নারীমুক্তির প্রতিফলন দেখা যায়। বাংলার মুসলিম নারী জাগরণ, নারী উন্নয়ন ও নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া পুরুষ শাসিত সমাজের নির্মম নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও কুসংস্কারে জর্জরিত অশিক্ষা ও পর্দার নামে অবরুদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য নারীসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। মুক্তির পথ দেখিয়েছেন উপমহাদেশের রক্ষণশীল মুসলিমসমাজের নারীদের। তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই নারীসমাজ নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে পারবে। নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি কখনো পুরুষকে ছোটো করে দেখেননি। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোড়াইয়া খোড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্য তাহাই।' তিনি বুঝেছেন, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে নারী-পুরুষের সমতা অনস্বীকার্য। তিনি লিখেছেন, 'দেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ, মানুষের সবরকমের কাজকর্মের প্রয়োজনেই দুটি চক্ষুর গুরুত্ব সমান।'

অসচেতন নারীসমাজকে সচেতন করার জন্য তিনি আহ্বান করেন, 'ভগিনীরা! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বলো কন্যে আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো আমরা মানুষ।' ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া বিধবা নারীদের কর্মসংস্থান, দরিদ্র অসহায় বালিকাদের শিক্ষা, বিয়ের ব্যবস্থা, দুস্থ মহিলাদের কুটিরশিল্পের প্রশিক্ষণ, নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞানদান, বস্তিবাসী মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম মুসলিম মহিলা সমিতি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'।

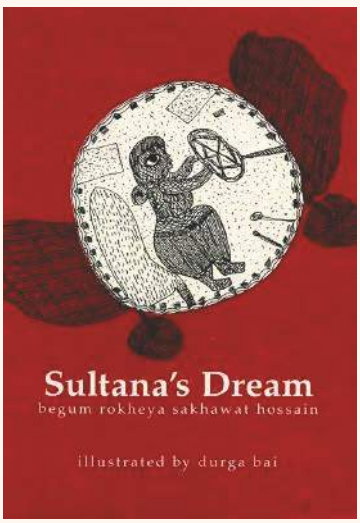

তৎকালীন বাংলার পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত মুসলিম নারীদের গৃহকোণের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের ইতিহাসে এই সমিতির অবদান অপরিসীম। বেগম রোকেয়া ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় নারী সম্মেলনে পঠিত ভাষণে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পুরুষ-স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সা.)। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা লাভ করা সব নরনারীর অবশ্য কর্তব্য।'

নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছেন। নারীসমাজ ও পুরো সমাজকে সচেতন করার জন্য তিনি বলেছেন, 'আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে। তবু মনে হয়, পুরাকালে সভ্যতা ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এইরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সাথে সাথে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।' তিনি তাঁর সাহসী লেখনীর মাধ্যমে নারীসমাজকে সংগঠিত করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ডাকই দেননি, প্রস্তুত করার দায়িত্বও নিয়েছেন। তিনি নারী শিক্ষাকে কখনো পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের মাঝে দেখতে চাননি। তিনি শিক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে (নারীদের) নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে'। অন্ন-বস্ত্রের জন্য নারী যেন কারও গলগ্রহ না হয়– এটাই ছিল বেগম রোকেয়ার প্রত্যাশা। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, রাতারাতি কোনো আন্দোলনের মাধ্যমে নারীসমাজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এ সত্যকে উপলব্ধি করে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি ইহা অবরোধ থাকার জন্য হই নাই, শিক্ষার অভাবে হইয়াছি।' তিনি তাঁর রচনা দিয়ে ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ করতে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে বাংলাদেশ সরকার একটি গণ-উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে পৈতৃক ভিটায় ৩ দশমিক ১৫ একর ভূমির ওপর নির্মিত হয়েছে বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র। এতে অফিস ভবন, সর্বাধুনিক গেস্ট হাউস, ৪তলা ডরমেটরি ভবন, গবেষণা কক্ষ, লাইব্রেরি ইত্যাদি রয়েছে। স্মৃতিকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়। রংপুরের একমাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 'রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়' ৮ই অক্টোবর ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়। এছাড়াও, মহীয়সী বাঙালি নারী হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসনের জন্য রোকেয়া হলের নামকরণ করা হয়।

বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর পৈতৃক স্থানে একটি স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তাঁর অসামান্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ রংপুর বিভাগের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর' করা হয়। তিনি আমাদের ভেতর বেঁচে আছেন, থাকবেন নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে। বেগম রোকেয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। তাঁকে বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইমরান পরশ: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক, imranparosh@gmail.com

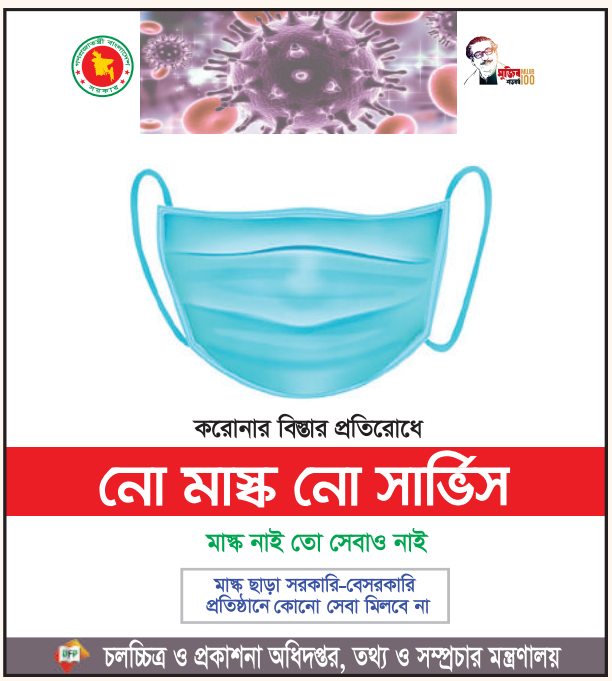

শহিদ ফুটবলার মজিবর রহমান

মিয়াজান কবীর

রাজধানী ঢাকা শহরের বুক চিড়ে বয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা। কত জয়-পরাজয়ের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই বুড়িগঙ্গা নদীটি। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে কেরানীগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রাম, নাম তার আগানগর। এই আগানগরে ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন মজিবর রহমান। তাঁর বাবার নাম চাঁন মিয়া আর মায়ের নাম হালিমা খানম। বাবা-মায়ের দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোটো। মজিবর রহমানের শিক্ষায় হাতেখড়ি আগানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর ভর্তি হন হাম্মাদিয়া হাই স্কুলে। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। ফলে লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন তিনি। ফুটবল খেলার টানে তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে।

১৯৬২ সালে মজিবর রহমান ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাবে যোগ দেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফুটবল কোচ সাহেব আলী ও বজলুর রহমানের কাছে ফুটবল খেলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দক্ষ কোচের প্রশিক্ষণে মজিবর রহমান একজন সুনিপুণ ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। খেলায় নৈপুণ্যতা, সাহসিকতা, প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ কৌশলতায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। নিজ প্রতিভায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি দর্শকনন্দিত হন।

মজিবর রহমানের গায়ের রং ছিল মিশমিশে কালো। তাই তাঁর খেলার সাথীরা তাকে 'কালে খাঁ' বলে ডাকতেন। দীর্ঘ দেহী, বলিষ্ঠ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মজিবর রহমান (কালে খাঁ) খেলতেন রাইটস সুপার ব্যাকে। খেলার মাঠে ডিফেন্সকে ঘিরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান থেকে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতায়। একজন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় হিসেবে কালে খাঁকে সমীহ করত প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা।

১৯৬৪ সালের কথা। তখন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছিল খুবই শক্তিশালী টিম। শুধু তাই নয়, পর পর দুবছর অপরাজিত টিম হিসেবে ঢাকা স্টেডিয়ামে আলোড়ন সৃষ্টি করে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তাদের ডিফেন্সে রয়েছে বলাই, আবিদ হোসেন, পিন্টু, ক্যাপ্টেন আমিনের মতো দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়। ফরওয়ার্ডে অনন্য মুসা, রহমতউল্লাহ, আবদুল্লাহ, প্রতাপ হাজরা প্রমুখ। খেলার আগে পরিকল্পনা করা হলো খেলার মাঠের রক্ষণ ভাগকে আরও সুদৃঢ় করতে হলে দুর্ধর্ষ মুসাকে প্রতিরোধ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা মতো মুসাকে প্রতিরোধের ভার দেওয়া হলো কালে খাঁকে। ঢাকা ফুটবল লীগের সেই নাটকীয় ও অবিস্মরণীয় খেলায় ফায়ার সার্ভিস ৩-২ গোলে বিজয় লাভ করে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্ধর্ষ অনন্য খেলোয়াড় মুসাকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুখে দিয়ে কালে খাঁ সে খেলায় উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিলেন। মুসা তখন খেলার মাঠে শীর্ষে অবস্থান করছে। তৎকালীন পাকিস্তানি ফুটবলের প্রাণ, ক্ষিপ্র, কৌশলী চাতুর্যপূর্ণ ও অসাধারণ ফুটবল শিল্পী মুসাকে রুখে দেওয়া তখন দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু মুসার দুর্দণ্ডতার এক ধাপ বেশি এগিয়ে কালে খাঁ সেদিন সুকৌশলে মুসাকে রুখে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *মর্নিং নিউজে* খবর প্রকাশিত হয়েছিল– 'দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অঘটন।'

মজিবর রহমান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সহজ-সরল-সাদাসিধে-বিনয়ী-নম্র স্বভাবের মানুষ। কিন্তু খেলার মাঠে ছিলেন উদ্দাম, দুর্ধর্ষ, দুরন্ত, দুর্দান্ত, ক্ষিপ্রতায় ব্যাঘ্রের চেয়েও গতিশীল। এই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়ের গতিশীলতায় ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাব সজীব হয়ে ওঠে। 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাব। এই সুনামের মূলেও কালে খাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি একজন চৌকষ খেলোয়াড় হিসেবে জাতীয় টিমে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন, কালে খাঁ যিনি বড়ো ম্যাচে নামিদামি খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ভালো খেলার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। অপর দিকে খেলার মাঠের বাইরে তাঁর রসাত্মক কথা শুনে খেলোয়াড়রা নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। ১৯৬৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের খেলোয়াড় হিসেবে পাকিস্তানের করাচিতে খেলায় অংশগ্রহণ করেন কালে খাঁ। ফায়ার সার্ভিস অ্যাথলেটিক ক্লাবের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কালে খাঁ শুধু একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন তা নয়, তিনি একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৬ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের অধীনে 'আগানগর পল্লী মঙ্গল সমিতি' (এপিএস) নামে একটি ফুটবল টিম গঠন করেন। এছাড়াও তাঁর হাতে গড়া নামিদামি খেলোয়াড় হিসেবে অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সরকারি অফিসের ফুটবল টিম নিয়ে খেলার আয়োজন করতে জোর প্রচেষ্টা চালায় সামরিক সরকার। সরকারের এই হীন কৌশল বুঝতে পেরে সরকারি অফিসের ফুটবল টিমগুলো খেলা থেকে বিরত থাকে। ঢাকার মাঠে যাতে খেলা না হতে পারে এ ব্যাপারে কালে খাঁও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

মজিবর রহমান দেশের ভেতরে থেকে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। তাঁর সময়কালে অন্যতম দ্রুতগামী সেরা খেলোয়াড় মুসাকে যেমন খেলার মাঠে রীতিমতো বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন, তেমনি এই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় ঘোল খাইয়েছেন পাকিস্তান বর্বর বাহিনীকেও। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে আঘাত হেনেছেন বর্বর দুশমনের ওপর। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ধরা পড়েন হানাদার বাহিনীর কাছে। হানাদার বর্বর বাহিনী অমানুষিক নির্যাতন করে নৃশংসভাবে হত্যা করে এই দেশবরেণ্য খেলোয়াড় কালে খাঁকে। নির্মমভাবে হত্যার পর তাঁর লাশ ফেলে দেয় বুড়িগঙ্গা নদীতে। বুড়িগঙ্গা নদী স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধাদের রক্তে বার বার রঞ্জিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ মজিবর রহমানের বুকের শানিত ধারায় বুড়িগঙ্গার জল লালে লাল হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের মেধা-মননের শূন্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাকিস্তানি বাহিনী এক জঘন্যতম নীলনকশা প্রণয়ন করে। নীলনকশা বাস্তবায়নে ১৪ই ডিসেম্বর হানাদার বর্বর বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। এই নির্মম-নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন মজিবর রহমান কালে খাঁ। ইতিহাসের পাতায় এ এক মর্মান্তিক ঘটনা, এক করুণ ট্র্যাজেডি!

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক, miajankabir@gmail.com

প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের পদক্ষেপ

নওশান আহমেদ

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ। তাই তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। উপযুক্ত সেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ পেলে প্রতিবন্ধীরাও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদাপূরণে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে আন্তরিক হতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে টেকসই বিশ্ব গড়তে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। সমাজের অনগ্রসর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অবহেলিত রেখে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ যে সকল দপ্তর-সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' তাদের মধ্যে অন্যতম। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক ও রেফারেল সেবা প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সমস্ত সেবা কেন্দ্রের আওতায় একটি করে অটিজম ও এনডিডি কর্নার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং ইত্যাদি কার্যক্রম চালু আছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে জুন ২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৫,৮২,৯০৭ জন এবং মোট প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ৭৯,৫৩,৭৫১টি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান ছাড়াও সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ৪৫,৫৪৩টি উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৩,৬৫,৬৯৭ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ৮,৩৪,৩০৮টি। এছাড়া জুন ২০১৭ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে একটি মোবাইল থেরাপি ভ্যান ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে সপ্তাহে তিনদিন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতা ১৩৪৪ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ২১,৭৩১টি।

এছাড়া অটিজম রিসোর্স সেন্টার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাকে অনুদান বিতরণ, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এনডিডি) সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ি এবং রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল,

রংপুর, সিলেট– এই ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টিসহ সর্বমোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে মোট ১৪৭ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের পিতা-মাতাদের বিভিন্ন প্রকার কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৩,৬৪৫টি সেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়েল ও থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর ৯০ জন অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

এই নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োগসহ সকল নাগরিক অধিকার ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে দেওয়া হচ্ছে। সেরিব্রাল চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী প্রত্যাশী ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে অধিকার বাস্তবায়নের জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন দুটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অবাধ চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রে নিশ্চিত করেছে। পালসি (সিপি) এতিম শিশুদের লালনপালন, শিশু নিবাস পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া চাকরি ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাস ৩২টি করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন চত্বরে ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর পাঁচ দিন মেয়াদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরিকৃত বিভিন্ন হস্তশিল্প, নকশিকাঁথা, তৈরি পোশাক, শাড়ি, খেলনাসামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। প্রতিবছর মেলায় ৩৫-৪০টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে এবং ১০-১৫ লক্ষ টাকার পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয়। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালাটি যুগোপযোগী সংশোধন ও পরিমার্জন পূর্বক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ১০ই অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশে গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস সরকারিভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিবসে ফাউন্ডেশন থেকে ২০ জন মেধাবী বাক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীকে ৫,০০০ টাকা করে অনুদান ও সনদ প্রদান করা হয়।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও ERCPH (শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করার কার্যক্রম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও CRP (Centre for the Rehabilitation of the Paralysed)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ১০২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৯ জন চাকরিতে নিয়োজিত আছেন।

কোভিড-১৯ জনিত কারণে 'লক ডাউন' পরিস্থিতিতে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সর্বমোট এক কোটি ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণকৃত ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে সর্বমোট ১৭,৭৫৫ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী উপকৃত হয়েছে। উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী মহিলা। ঢাকা জেলায় ৪৫টি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৬৩টি জেলায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৯৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০৬ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪-এ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডরমেটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এলক্ষ্যে দেশে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ সকল আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে সমাজের সকলেরই উচিত মন-মানসিকতার পরিবর্তন করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল আর্থসামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। সকলের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো ।

নওশান আহমেদ: প্রাবন্ধিক

নছিমন বিবির গোয়েন্দাগিরি

আ. শ. ম. বাবর আলী

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে বছর শুরু হয়, নছিমন বিবির বয়স তখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে সামনের দিকে মাজা ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে চলে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছে ভারতে। উঠেছে ওখানকার একটা আশ্রয় ক্যাম্পে। স্বামী মারা গেছে অনেকদিন আগে। একমাত্র ছেলে রমজান আলী। তার সাথেই সে চলে এসেছে এখানে। তাকে আশ্রয় ক্যাম্পে অন্যান্যদের সাথে রেখে রমজান আলী চলে গেছে মুক্তিযুদ্ধে। মাঝে মাঝে আসে মায়ের সাথে দেখা করতে। ছেলের কাছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্প শোনে নছিমন বিবি। শুনতে খুব ভালো লাগে তার। যেদিন শোনে আজ সে দু'চারটে খানসেনা খতম করে এসেছে, সেদিন খুশিতে মনটা তার ভরে ওঠে। ছেলের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করে। দোয়া করে আক্রান্ত গোটা দেশবাসীর জন্য। উৎসুক হয়ে দিন গুণতে থাকে, কবে এ দেশটা শত্রুমুক্ত হবে। বিজয়ীর বেশে এ দেশের সব সাহসী সন্তানরা ফিরে আসবে জয়ধ্বনি করতে করতে। সেই দিনটার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত সে অপেক্ষা করতে থাকে।

ছেলের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে তার বার্ধক্যভরা শরীরটাও যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আশ্রয় ক্যাম্পে তার সময় কাটে না।

একদিন ছেলে রমজান আলীকে নছিমন বিবি বলে, 'আমিও তোর সাথে যুদ্ধে যাব বাবা।'

মার কথা শুনে হাসি পায় রমজান আলীর। বলে, 'কী পাগলামির কথা তুমি বলছ মা! মুক্তিযুদ্ধ কি এত সহজ ব্যাপার? অনেক কষ্টের কাজ।'

নছিমন বিবি বলে, 'তা তো জানি। কিন্তু তোরা সে কষ্ট সইতে পারলে, আমি পারব না কেন?'

রমজান আলী বলে, 'তোমার তো অনেক বয়স হয়েছে। তুমি কি এ কাজ পারো? জীবন বাজি রেখে এ কাজ করতে হয়।'

নছিমন বিবি বলে, 'জীবন বাজি তুই রাখতে পারলে, আমি পারব না কেন?'

এমনিভাবে মা-ছেলের মধ্যে অনেক কথা হয়। মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না রমজান আলী। মা তার মুক্তিযুদ্ধে যাবেই। ভেবে পায় না, মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা আর শারীরিক সমর্থতা মাকে সে কেমন করে বোঝাবে।

এমনিভাবে ছেলে রমজান আলী যখনই আসে তার মায়ের সাথে দেখা করতে, তখনই মা তার বায়না ধরে মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্য, তার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। প্রতিবারই একইভাবে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করে রমজান আলী।

কিন্তু নছিমন বিবির মন বোঝে না কোনো কিছুতেই। অস্থিরভাবে কাটতে থাকে তার দুঃসময় দিনগুলো।

একদিন নছিমন বিবির কাছে খবর এল, খানসেনাদের সাথে একটা সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হয়েছে তার ছেলে রমজান আলী। খবরটা শুনে প্রথমে খুব কেঁদেছিল নছিমন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর বলেছিল, 'ও তো মারা গেল দেশটা মুক্ত করার আগে। শেষের দায়িত্বটা দিয়ে গেল আমাদের ওপর।'

এরপর থেকে নছিমন আর অন্য কিছু ভাবেনি। দিবারাত্র তার একমাত্র ভাবনা, সে যুদ্ধে যাবে। মুক্তিযোদ্ধা হবে সে। দেশের জন্য যুদ্ধ করে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের একজন অংশীদার হয়ে জীবনের মহান নৈতিক দায়িত্ব পালন করবে, তা সে জীবনের যে কিছুরই বিনিময়ে হোক।

এমনিভাবে ভাবতে ভাবতে একদিন হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করতে করতে যাত্রা করল নছিমন বিবি নিকটবর্তী একটা মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং ক্যাম্পের উদ্দেশে। অনেক কষ্টে বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে হাজির হলো ক্যাম্পে। দেখা করল ক্যাম্পের লিডার মেজর শফির সাথে। তার কাছে খুলে বলল নিজের কঠোর ইচ্ছার কথা।

নছিমনের কথা শুনে একটু হাসলেন মেজর শফি। বললেন, 'তোমার ইচ্ছার কথা শুনে আমি খুব মুগ্ধ হলাম মা। কিন্তু এ যে অত্যন্ত কঠিন কাজ। অনেক পরিশ্রম, অনেক শক্তির প্রয়োজন। কেমন করে তুমি তা পারবে মা? তবু মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এই যে তোমার আগ্রহ, এতেই জাতি তোমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য করবে।'

কিন্তু কোনো অসমাপ্ত বাক্যে কাজ হয় না। নছিমন মুক্তিযুদ্ধে যাবেই।

মেজর শফি বললেন, 'এতে যে-কোনো সময় মৃত্যুর ভয় আছে,

তা কি তুমি জানো মা?'

নছিমন বলল, 'না, আমি জানি না। মৃত্যু আছে জানি; কিন্তু তার ভয় আছে বলে আমি জানি না।'

মেজর শফি বললেন, 'মৃত্যুর কথা জেনেও তুমি যেতে চাও?'

নছিমন বলল, 'বাবা, তুমি তো মুক্তিযোদ্ধার একজন বড়ো অফিসার। বাবা বলো তো, শুধু তোমার অধীনেই নয়, গোটা বাংলাদেশে কি এমন একজনও মুক্তিযোদ্ধা আছে, যে তার জীবনের মৃত্যুভয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে এসেছে? মুক্তিযুদ্ধে আসবার সময় তারা সবাইতো মৃত্যুকে অবধারিত জ্ঞান করে এ মহৎ কাজে এসেছে। মৃত্যুকে যারা ভয় করেছে, তারা কেউ তো এখানে আসেনি।'

বৃদ্ধা নছিমনের মুখে এমন একটা অতি চরম সত্যি কথা শুনে চমকে উঠলেন মেজর শফি। অবাক হয়ে নছিমনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবতে লাগলেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একজন শিক্ষানবিশ মুক্তযোদ্ধাকে দিয়ে সালাম পাঠালেন মেজর মোমেনের কাছে।

মেজর মোমেন এই ক্যাম্পের গোয়েন্দা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণের প্রধান।

তিনি হাজির হলেন।

মেজর শফি তাকে বললেন বৃদ্ধা নছিমন বিবির প্রচণ্ড ইচ্ছার কথা।

বৃদ্ধার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন মেজর মোমেন। কিছুক্ষণ ধরে ভাবলেন।

তারপর মেজর শফির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখি কী করা যায়।'

মেজর মোমেনের মুখে এতটুকু শুনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধা নছিমন বিবির সারামুখ।

মেজর মোমেন বৃদ্ধাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তার ক্যাম্পে।

একজন গুপ্তচরের দায়িত্ব পেল নছিমন বিবি। বেশ ধরল একজন ভিখারির। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন শরীর। বহুছিন্ন তালি দেওয়া ময়লা একটা সাদা শাড়ি পরা, হাতে ঝুলানো একটা ময়লা থলে।

ভিক্ষা করতে যায় সবখানে। বিশেষ করে খানসেনাদের ক্যাম্পে।

সেখানে যেয়ে ওদের কাছে ভিক্ষা চায়।

এমন বয়সি একজন বৃদ্ধাকে ভিক্ষা করতে দেখে ওদের করুণা হয়। খানসেনারা তাকে ভিক্ষা দেয়। যখন আসে, তখনই রুটি, আটা, এমনকি টাকা-পয়সা ইত্যাদি দেয়।

নছিমন বিবি সেখানে ভিক্ষা করে আর তাকিয়ে থাকে এদিক-ওদিক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অনেক কিছু। ওদের যুদ্ধাস্ত্র সব কোথায় রাখে, কীভাবে রাখে।

চোখে দেখে মনে মনে মুখস্থ করে।

এক এক দিন আসে আর এক এক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে। পরে পৌঁছিয়ে দেয় সেসব তথ্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

মুক্তিযোদ্ধারা সেসব তথ্যের ভিত্তিতে খানসেনাদের ওপর অপারেশন চালায়। জয়ী হয় কতখানে। কতক্ষেত্রে।

নছিমন বিবি বয়সে অতি বৃদ্ধা তো বটেই, কিন্তু তারচেয়ে আরও বার্ধক্য আর দুর্বলতার ভান করে। তাতে করে খানসেনারা তাকে নিয়ে কোনো রকম ভাবতেও পারে না।

নছিমন বিবির এমন অভিনয় আর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে তার ওপর ভীষণ খুশি মেজর মোমেন।

এমনিভাবে চলতে থাকে নছিমন বিবির সুদক্ষ গোয়েন্দাগিরি।

ভিক্ষুক হয়ে খানসেনাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এনে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে এনে দেওয়া।

কাজটা মোটেই নিরাপদ নয়। বিপদ ঘটতে পারে যে-কোনো দিন। যে-কোনো সময়।

ঘটলোও।

বরাবরের মতো একদিন সে একইভাবে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল খানসেনাদের ক্যাম্পে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাতরস্বরে সে ভিক্ষা চাইছিল। বলছিল তার দুঃখময় জীবনের সব কাহিনি। কয়েকজন খানসেনা সহানুভূতির সাথে মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল। নছিমন বিবি তার কথা বলেই যাচ্ছিল।

আজ তার উদ্দেশ্য অন্যরকম। তা হচ্ছে, বেশি সময় কাটানো। এই সময়ে সে গল্পের ফাঁকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। তার প্রতি অধিকতর সহানুভূতি অর্জন করে তাদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে, কাছ থেকে কৌশলে আরও গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে।

কিন্তু হঠাৎ করে ঘটনাটা ঘটে গেল।

নছিমন বিবির পরা শাড়ির কোমরের দুপাশে গোজা ছিল দুটো গ্রেনেড। ও দুটো এভাবে সে সবসময়ই সাথে রাখতো। তার ওপর কোনো বিপদ দেখলে শত্রুপক্ষের দিকে সে ছুড়ে মারবে। অথবা প্রয়োজন আর সুযোগ মতো ব্যবহার করে শত্রু খতম করবে। সেদিন খানসেনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এক সময় পরনের শাড়ি ঢিলা হয়ে হঠাৎ করে গ্রেনেড দুটো খসে পড়ল মাটিতে।

হয়ত খুব নিচু থেকে পড়াতে এবং মাটিটা নরম থাকাতে একটাও গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো না। কিন্তু এ অবস্থা দেখে পিশাচের মতো করে চিৎকার দিয়ে উঠল খানসেনারা। তাদের আর বুঝতে বাকি রইল না আসল ব্যাপারটা। চিনতে অসুবিধা হলো না ছদ্মবেশী নছিমন বিবিকে। একজন খানসেনা সাথে সাথেই হাতের রাইফেল নছিমনের দিকে তাক করে ট্রিগার টানল। 'দ্রাম' করে একটা শব্দ হলো।

একটা করুণ আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নছিমন বিবি। তারপর অনেক কষ্টে কণ্ঠের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার দেওয়ার মতো করে জীবনের শেষ সংলাপটি উচ্চারণ করল– 'জয় বাংলা'।

বুকে বুলেটের যন্ত্রণায় মাটির উপরে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল নছিমন বিবি।

আর তার মুখে 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনে আরও ক্ষেপে গেল খানসেনাদের দল। আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল তারা। একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃদ্ধা নছিমন বিবির ওপর। চারদিক দিয়ে একসাথে বেয়োনেট নিয়ে খোঁচাতে থাকল নছিমন বিবির বার্ধক্যময় শরীরটাকে।

আরও তীব্রভাবে ছটফট করতে থাকল মৃত্যুর শয়ানে শায়িত নছিমন বিবির রক্তাক্ত শরীর।

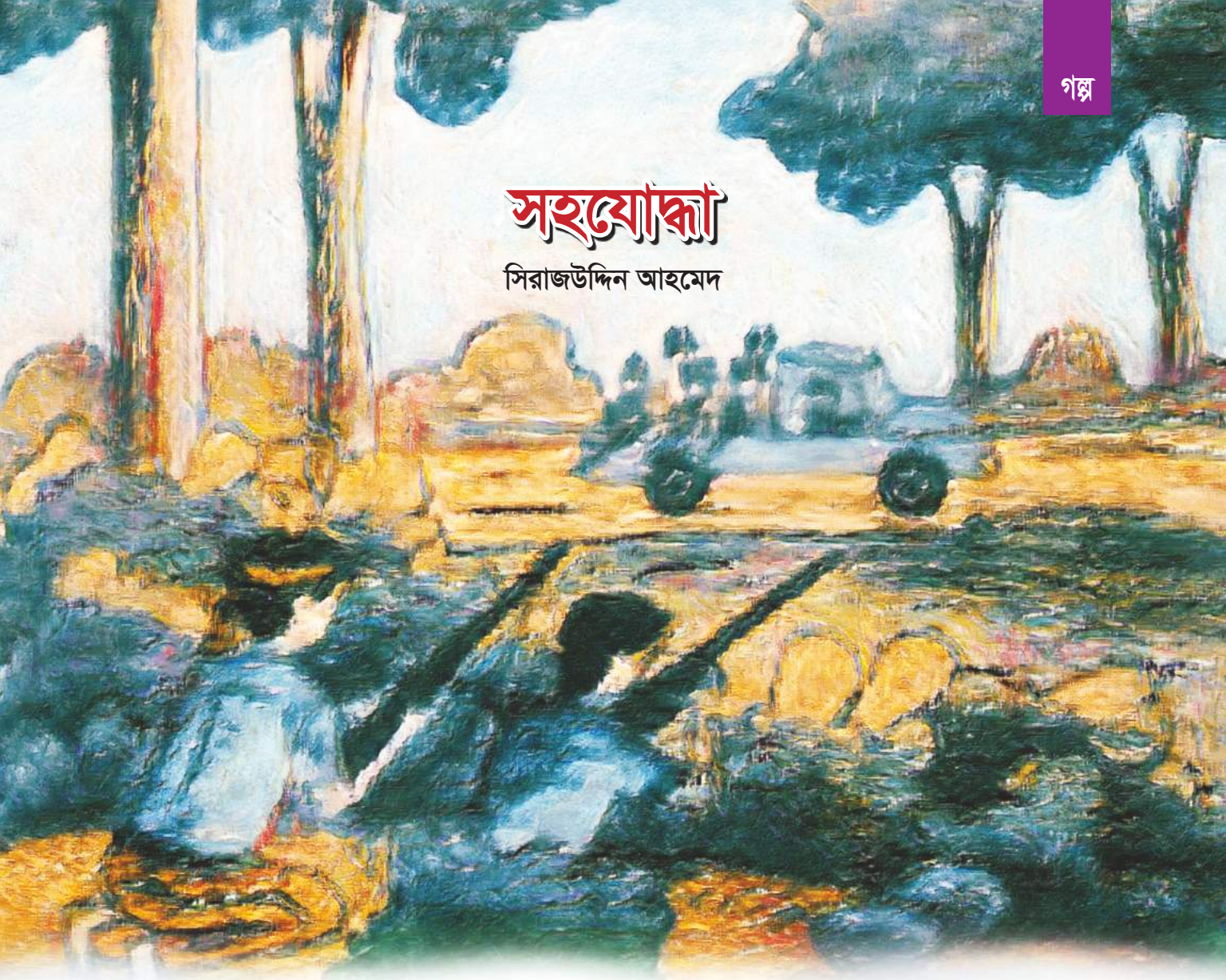

সহযোদ্ধা

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

বাড়ির গেট খুলে দারোয়ান মালেক দেখল লোকটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচাপাকা চুল আর দাড়ি-গোঁফের দখলে মুখ প্রায় ঢাকা পড়েছে। তার মাঝে চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বেশভূষা মলিন, অভাবে পুষ্টিহীনতায় শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে; কিন্তু একসময় যে বলবান ছিল তার কিছু রেশ এখনো রয়ে গেছে। লোকটির চোখের দিকে তাকাতে মালেকের ভয় করে। উদ্ভ্রান্ত চোখ, এলোমেলো চাহনি, পাগল পাগল মনে হয়।

দারোয়ান মালেক চেঁচিয়ে বলল, সইরা খাড়ান, সাহেব এখন বাহিরে যাইবে।

লোকটি ব্যাকুল চোখে পরম আগ্রহে গাড়ির আরোহীকে দেখার চেষ্টা করল, রঙিন গ্লাসের কারণে গাড়ির যাত্রী কিংবা ড্রাইভার– কাউকে দেখতে পেল না।

মালেক এ বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি নিয়েছে দুই বছরও হয়নি। তার আগে এ বাড়ির দারোয়ান ছিল মালেকের চাচা। চাচার বয়স হওয়ায় সেই চাকরি মালেককে দিয়ে গেছে। এ বাড়ির মালিক আজব কিসিমের। এত সুন্দর বাড়ি, গেট দিয়ে ঢুকলে প্রথমে চোখে পড়ে একটি পুরোনো জরাজীর্ণ গাড়ি মহাসমাদরে একটি বিশিষ্ট মঞ্চে রাখা হয়েছে। গাড়ির আদরযত্ন দেখলে মনে হয়, গাড়ি তো নয় যেন বিয়ের নওশা।

লোকটির প্রতি মালেকের আজ মায়া হলো। লোকটি তিন দিন ধরে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মালেক গেট থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়। আজ গেট বন্ধ করে পকেট-গেট দিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনে রোজ রোজ খাড়াইয়া থাকেন ক্যান, কী চান ?

লোকটি ব্যাকুল হয়ে বলল, আমি বিশ বছর ধরে একটি গাড়ি খুঁজে ফিরছি; ভক্সওয়াগন, মডেল ১৯৬৫, নম্বর প্লেট CHI- KA-1971। ভাই, বাড়ির ভেতর ঐ গাড়িটা দেখতে চাই, কাছ থেকে একনজর দেখে চলে যাবো। দেন ভাই, একটু দেখতে দেন, আর কোনোদিন আসব না।

মালেক চমকে উঠল। ভাইরে, আপনেরে বাড়িতে ঢুকাইলে আমার চাকরি থাকবো না। ঐ গাড়িটা সাহেবের জান। কাউরে হাত দিতে দেয় না, নিজ হাতে যত্ন করে। দেখেন না ভাঙা গাড়ি কেমুন যত্নে রাখছে !

ভাই, আপনি কি ঐ গাড়ির নম্বর কইতে পারবেন ?

আমি পড়ালেখা জানি না, নম্বর কইতে পারমু না। আপনে দুই দিন

পরে আসেন। সাহেবরে বইলা দেখি, যদি পারমিশন দেয় আপনে দেখবার পারবেন।

রাতের শেষ প্রহরে CHI-KA-1971 নম্বর ভক্সওয়াগন গাড়িটি লোকটিকে বলছে, স্যালুট সহযোদ্ধা, তুমি কেমন মানুষ, আমাকে চিনতে পারছো না ! আমি এখনো তোমার যত্ন-সেবা, ভালোবাসা ভুলতে পারি না। তোমার সাহস, ত্যাগ, বীরত্ব আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা তিনজন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে সেইসব দুঃসাহসিক অপারেশন স্মৃতিতে গৌরবে বিজয়ের আনন্দে আজও ভাস্বর হয়ে আছি। ভুলতে পারি না, তোমাদের ভুলতে পারি না।

ঘুম থেকে উঠে সাতসকালে বাড়ির গেটে হাজির হয়ে গেল লোকটি। আর কোনো দ্বিধা নেই। বিশ বছর ধরে সে যাকে খুঁজে ফিরেছে, তার প্রিয় ভক্সওয়াগন গাড়ি, তার বন্ধু নিত্যসহচর, সাহসী সহযোদ্ধা, আজ তার দেখা পাবে।

দারোয়ান মালেক লোকটিকে দেখে মহাসমাদরে এগিয়ে এসে সালাম দিল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আসেন সাহেব, ভেতরে আসেন। মালেক ছুটে গেল বাড়ির ভেতর।

গাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালো লোকটি, এইতো তার হারানো মানিক, তার সহযোদ্ধা! CHI-KA-1971 নম্বর আমার ভক্সওয়াগন; বুড়ো হয়েছে, আগের সেই জৌলুশ-তেজ এখন নেই। লোকটির চোখ বাধ মানে না। এ শুধু ফিরে পাওয়ার আনন্দ নয়, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়ার প্রশান্তি। লোকটি পরম মমতায় হাত বুলাচ্ছে আর চোখ থেকে আনন্দ-অশ্রু ঝরছে। ফোঁটায় ফোঁটায় গাড়ির বডিতে পড়ছে। গাড়িটি ফিসফিস করে বলছে, লিডার, অশ্রু সংবরণ করো। কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছেন।

বাড়ির মালিক মীর ফজল অপলক চোখে লোকটিকে দেখছে। চুল-দাড়ি বয়সে এতগুলো বছর ঢাকা পড়া সত্ত্বেও তাঁর সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা কাসেম, তাঁর ভক্সওয়াগন গাড়ির ড্রাইভার কাসেমকে চিনতে মীরের একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। তাঁর চোখেও কাসেমকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ-অশ্রু। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ নিথর হয়ে থাকল দুজন। কাসেম বুক টান করে স্যালুট দিল। মীরও স্যালুট দিয়ে প্রতি সম্মান জানালো তাঁর সহযোদ্ধাকে। তারপর বুকে আঁকড়ে ধরল পরস্পরকে।

চা খেতে খেতে কাসেম বলল, আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাহাড়তলীর সুধাংশু ডাক্তারের কাছে রেখে অস্ত্র বোঝাই ভক্সওয়াগন কর্ণফুলীতে ডুবিয়ে দিলাম। তারপর আমার বাড়িতে ছুটে গেলাম। আমার বাড়ি আর্মি ঘেরাও করেছে। আমি চিটাগাং থেকে আখাউড়া, সেখানে কদিন থেকে সুযোগ বুঝে আগরতলা।

মীর বলল, সুধাংশু ডাক্তার পনেরো দিন পর আমাকে গ্রামে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলো। আমার পায়ের তখন যে অবস্থা, গেরিলা যুদ্ধে সক্রিয় থাকা সম্ভব ছিল না। গ্রামে থেকে খবর পাই বাবা, ছোটো ভাই নিখোঁজ। আমাদের বাড়ি আর্মির টর্চার সেল হয়েছে।

কাসেম ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, গাড়ির খোঁজ পেলেন কীভাবে? আপনি তো জানতেন না– কর্ণফুলীতে আমি গাড়ি ডুবিয়ে রেখেছি।

মীর বলল, দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর আমার পা ঠিক হতে আরও তিনমাস সময় লেগেছে। প্রথমে তোর খোঁজ করেছি, পাইনি। তারপর ব্যক্তিগত সূত্রে ও পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গাড়ির খোঁজ করি। সাতটি সূত্র পাই, সেই সূত্র ধরে খুঁজে কর্ণফুলী থেকে গাড়িটি উদ্ধার করি। তুই এতদিন ছিলি কোথায় ?

কাসেম বলল, পরে আমি আরও দুটি অপারেশনে অংশ নেই। শেষ অপারেশনে আমার বাঁ পায়ের গোড়ালি উড়ে গেল। প্রথমে ফিল্ড হাসপাতাল, সেখান থেকে কলকাতায়, তারপর চেন্নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর কৃত্রিম পা নিয়ে চিটাগাং ফিরি। আমার মা-ভাইয়ের খোঁজ পেলাম না। আপনার বাড়ি তখন অন্যের বাড়ি। আপনার খোঁজ কেউ বলতে পারে না। গাড়ির খোঁজে কর্ণফুলীতে গেলাম। আমার চেনা জায়গা, লোক নামিয়ে খোঁজখবর করলাম, গাড়ি নেই। তারপর বিশ বছর ধরে আপনাকে, গাড়িকে খুঁজে ফিরছি। আপনারা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে এখন আমার কেউ নেই।

কাসেমের কাঁধ দুহাতে আঁকড়ে ঝাঁকি দিয়ে মীর বলল, দেরিতে হোক তবুও আমাদের তিন সহযোদ্ধার দেখা হয়েছে। এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকব। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশ গড়ার কাজ করতে হবে। আমি যুদ্ধশিশুদের লালনপালন ও পড়ালেখা শেখানোর একটি প্রকল্প চালাই। তোর কাজ হবে, আমার মুক্তিযুদ্ধের একটি সংগ্রহ আছে সেটা দেখাশোনা করা, আর আমাদের আরেক সহযোদ্ধা ভক্সওয়াগন গাড়িটি তুই চালাতি, সেবাযত্ন করতি, এখন থেকে ওর দায়িত্ব তোর।

কাসেমের মনে হলো সে যেন আরেক মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত সৈনিক। বুক টানটান করে কমান্ডারের আদেশ শিরোধার্য করে নিলো।

একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কাছে দাঁড়িয়ে মীর বলল, চিনতে পারিস, রাইফেল নম্বর EPR 57621 মুক্তিযুদ্ধে তোর হাতিয়ার। পাশের স্টেনগানটি আমার। গাড়ির সব অস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমি সারেন্ডার করেছি। এ দুটি অস্ত্র সরকারি অনুমতিক্রমে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি।

কটি পদকের কাছে দাঁড়িয়ে মীর বলল, তুই কি জানিস মুক্তিযুদ্ধে সাহস, বীরত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার তোকে 'বীরবিক্রম' পদকে সম্মানিত করেছে ?

মুক্তিযুদ্ধে আমি পদক পেয়েছি ! কাসেম বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়ে।

তুই তখন নিখোঁজ, তোর পক্ষে আমি পদক গ্রহণ করেছি। পদকটি কাসেমের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আজ আমি দায়মুক্ত হলাম।

কাসেম পদক হাতে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, কমান্ডার, প্লিজ ফলো মি।

পদক হাতে কাসেম দ্রুত ছুটে গেল জরাজীর্ণ ভক্সওয়াগন গাড়ির কাছে। গাড়ির বডিতে পাঁচটি বুলেটের চিহ্ন। কাসেম ড্রাইভার শুধু গাড়ি চালাতো না, তার মনের কথা বুঝে গাড়ি নিজেই চলতো। কত অস্ত্র নিয়ে গাড়ি আর্মির চোখ ফাঁকি দিয়ে গোপনে গেরিলার হাতে পৌঁছে দিয়েছে; তার বিনিময়ে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

কাসেম বলল, কমান্ডার, এ পদক আমার নয়, এ পদক আমাদের সহযোদ্ধা গাড়ির। কাসেম গাড়ির ব্যাক মিররে বীরবিক্রম পদকটি ঝুলিয়ে দিলো।

মীর ও কাসেম স্যালুট দিয়ে সহযোদ্ধা গাড়িকে সম্মান জানালো। একফোঁটা জল কাসেমের হাতে এসে পড়ল। কাসেম চমকে তাকাল, কার চোখের জল? কমান্ডারের চোখের, তাঁর নিজের চোখের, নাকি গাড়ির কাচে জমে থাকা শিশির কণা!

আকাশ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবা

আখতারুল ইসলাম

আকাশের খুব মন খারাপ। নীল আকাশে কালো মেঘ জমলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশের মুখ। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

মা ছেলের মন খারাপ দেখে বলল, আকাশ কী হয়েছে বাবা, স্কুলে স্যাররা বকেছে?

আকাশ কেঁদে ফেলে, না মা, ওরা ... ...

ওরা কে, কী করেছে ...?

ওরা বলছে– আমার বাবা নাকি খোঁড়া, এক হাত নেই। ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মা বলছে– ওরা যা ইচ্ছে বলুক, এতে তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। ওরা জানে না, বুঝে না বলে এসব বলছে।

আকাশ মায়ের সান্ত্বনা মানতে চায় না।

না মা, ওরা প্রতিদিন এসব বলে, আমাকে ঠাট্টা উপহাস করে, আমাকে রাগায়, আমি আর স্কুলে যাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কাল তোমার সাথে স্কুলে যাব। তোমাদের ক্লাস টিচারকে বলব।

না মা, স্যার আমাকে বকা দেবে।

দেখবে কিছু বলবে না, স্যার তোমার বাবার বন্ধু।

আচ্ছা মা, বাবার হাত নাই কেন? আকাশের প্রশ্ন।

মা আমেনা বেগম কেঁদে ওঠে ছেলের কথায়। আকাশ হতবাক হয়ে যায়। মায়ের কান্নায় কী করবে ভেবে পায় না, বলে সরি, মা সরি আমি আর বলব না। হাত দিয়ে মায়ের চোখের পানি মুছে দেয়।

আমেনা বেগম ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কোনো কথা মুখ দিয়ে বের হয় না, এভাবে অনেকক্ষণ। পরে ছেলেকে নিয়ে ঘরে যায়। আকাশ তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বয়স সাড়ে আট বছর। হাজিপাড়া

প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

২

আমেনা বেগমকে স্কুলে দেখে অফিসের স্যাররা উঠে দাঁড়ায়।

আকাশ তো অবাক! তার মা কি স্কুলের স্যারদের চেয়েও বড়ো।

খালেদ স্যার: ভাবি বসেন। বসেন ভাবি। খালেদ স্যার আকাশের ক্লাস টিচার।

ভাবি কী মনে করে? কোনো প্রয়োজন হলে আমরা যেতাম।

না, ভাই তেমন কিছু না। একটা কথা বলার ছিল। এক পাশে গিয়ে আমেনা বেগম খালেদ স্যারকে আকাশের কথাটা খুলে বলে। খালেদ স্যার জিজ্ঞাসা করে আকাশ, কে কী বলেছে?

আকাশ বলল, নিজাম, জসিম, হাসমত এরা।

তুমি তো বাবা আমাকেও বলতে পারতে, তাহলে কষ্ট করে তোমার মাকে এখানে আসতে হতো না।

ভাবি আপনি যান, আমি দেখব। আকাশ তুমি ক্লাসে যাও। আকাশ ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে মায়ের চলে যাওয়া দেখছে ...।

৩

খালেদ স্যার ক্লাসে ঢুকে। তোমাদের আজ একটি সত্যি গল্প বলব। গল্পের কথা বলাতে সবার চোখে মুখে আনন্দের রেখা ফুটে ওঠে।

তোমরা তো জানো, আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। সে দিন আমরা বিজয় দিবস পালন করি। সবাই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ।

কিন্তু জানো কীভাবে আমরা বিজয় পেয়েছি, কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছি?

না, স্যার।

শোনো, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পর পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে যাঁরা নিজের জীবনকে বাজি ধরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁদের আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা বলি। আমাদের আকাশের বাবা, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

একথা শুনে সবাই আকাশের দিকে তাকায়। একে অন্যের সাথে ফিশ্ ফিশ্ করে কী যেন বলছে, আকাশের বুক গর্বে ভরে ওঠে।

আমার বাবা!

হ্যাঁ! খালেদ স্যার বলে, মনি ভাই আমার বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, আমাদের এক সহযোগী যোদ্ধা কর্ণফুলীর দক্ষিণে কানুনগো পাড়া গ্রামে পাকিস্তানিদের গুলিতে ১২ই নভেম্বর ১৯৭১ শহিদ হলে তার প্রতিশোধ নিতে মনি ভাই (মনিরুল ইসলাম) মরিয়া হয়ে ওঠে।

একের পর এক অপারেশনে অংশ নেয় তিনি, শত্রুদের বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করে। মনি ভাই ছিলেন বুদ্ধিমান। একদিন আমরা বারণ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানি হানাদার ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে। দিনটি ছিল ১৯শে নভেম্বর। দুর্ভাগ্য মনি ভাই ধরা পড়ে যায়। কয়েকজন রাজাকারও ছিল সেনা ক্যাম্পে। দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে মনি ভাইকে। পাকিস্তানি ক্যাম্প কমান্ডার তাঁকে চড়-থাপ্পড় মেরে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশীয় দালাল, যারা পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করত, সেই বিল্টু রাজাকার ও হামিদ রাজাকার বলে, না স্যার, ও মুক্তিযোদ্ধা হ্যায়।

এ কথা শুনে পাকিস্তানি আর্মিরা মনি ভাইয়ের মাথা লক্ষ করে গুলি তাক্ করল। এমন মুহূর্তে মনি ভাই দড়ি ছিঁড়ে দৌড় দেয়। কিন্তু গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় মনি ভাইয়ের বাম হাত।

আমরা ভেবেছি, মেরেই ফেলেছিল মনি ভাইকে পাকিস্তানি আর্মিরা। না, এই বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে মারতে পারেনি। আমরা বহু কষ্টে তাঁকে ডাক্তার দেখালে, বাম হাতটা কেটে বাদ দেয়। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের পরাজিত করে আমরা স্বাধীন হলাম।

আমরা মনি ভাইয়ের জন্য কান্না করছি দেখে মনি ভাই বলল, খালেদ কাঁদিস না, আমার হাত নেই তো কী হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন দেশ তো পেয়েছি।

খালেদ স্যার কেঁদে ওঠে। কাঁদে আকাশও। পুরো ক্লাস স্তব্ধ! মিজান, জসিম, হাসমত দাঁড়িয়ে যায়। তাদের ভুল বুঝতে পারে। স্যারের পায়ে ধরে বলে– স্যার, আমাদের ক্ষমা করবেন। আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমরা না জেনে আকাশকে কত কিছু বলেছি।

ঠিক আছে, ওঠ। আকাশ।

জ্বি স্যার।

ওরা ওদের ভুল বুঝতে পেরেছে। আকাশ চোখ মুছতে মুছতে বলে, ঠিক আছে স্যার।

আমরা আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান করব।

সবাই বলে, হ্যাঁ স্যার।

কারণ তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি।

ঘরে ফিরে আকাশ মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, আমি বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। গর্বে আমেনা বেগমের বুক ভরে যায়।

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

‘জয়বাংলা’ জয়ের ইতিহাস

সোহরাব পাশা

মৃত্যু শুধু কেড়ে নেয় ভালোবাসার বিনয়ী ভাষা
নিরন্তর অনুবাদ করে শূন্যতার
চিন্তাহীন– দীর্ঘ ইতিহাস
দুপুরবেলায় তীব্র ঝরে অন্ধকারের কুয়াশা–
জেগে থাকে মৃত্যুঞ্জয়ী আশা
সুন্দর আগামীর বিশ্বাস;

জন্মান্ধ খুনি জানে না
মানুষের স্বপ্নকে হত্যা করা যায় না,
বঙ্গবন্ধুর নির্জন বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্নদেখা
রক্তের অক্ষরে লেখা
‘জয়বাংলা’ জয়ের অমর ইতিহাস;

ভোরের নরম রোদে ছুটাছুটি করা
শেখ রাসেলের হাসি চোখে- আলোভরা
ঠোঁটে আজও ফুল ফোটে
নিবিড় ঘ্রাণের মুগ্ধতার ঢেউ ওঠে
বাঙালির অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের পটে;

ভালোবাসার গহীনে থাকে অঙ্গীকার
মৃত্যুভয় জয় করবার
সে জীবন হাসে স্বদেশের পতাকায়
মহাকালের সোনালি পাতায় পাতায়।

শব্দবারুদ

শেখ সালাহ্উদ্দীন

বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত
কিছু শানিত শব্দবারুদ অর্ধমৃত
মানুষকে একদা জাগিয়ে তোলে
সীমাবদ্ধতা নিমেষে ভোলে–

অতি সাধারণ জনগণ
সম্পদ বলতে শুধু একটা জীবন
শীর্ণ করতলে তুলে নিয়ে
দ্বিধাহীন গিয়েছে এগিয়ে
নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে দৃপ্ত পদভারে
সাধ্য কার আটকাতে পারে!
প্রসব-আসন্ন নতমুখী বউ, অদেখা সন্তান
ক্ষেতে পুষ্ট ধানের শিষের মোহন ইশারা- ম্লান;

এক তুখোড় হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা
সাড়ে সাত কোটি শোষিতের পুঞ্জীভূত জ্বালা
বক্ষে ধরে জ্বালিয়েছে অলৌকিক দ্রোহের আগুন
শিরা-ধমনিতে দুর্বার প্লাবন তোলে তপ্ত খুন
অতঃপর সেসব অকিঞ্চিৎকর প্রাণ
হলো বিধ্বংসী কামান গ্রেনেড মেশিনগান–

মহাবিজয়ের গাথা

ফারুক নওয়াজ

লাল-সবুজের বিজয় পতাকা, ঊর্ধ্বে আকাশ নীল
ডানা মেলে দিয়ে উড়ছে খুশিতে সাদা সাদা গাংচিল
পূর্ব আকাশে নতুন সূর্য, সোনালি নতুন ভোর
জয় বাংলার জয়োধ্বনিতে খুলে গেল সব দোর।
বিজয়-বিজয়, মহাবিজয়ের উচ্ছ্বাসে কাঁপে হাওয়া;
পূর্ণতা পেল দুখিবাঙালির শতজনমের চাওয়া।

শাসন-শোষণে জর্জর জাতি ব্যথা জমেছিল বুকে
মুঘল-পাঠান খড়্গ উঁচিয়ে কণ্ঠ দিয়েছে রুখে।
এলো লালমুখো ইঙ্গোবণিক; ক্রমে হয়ে ওঠে রাজা;
দুশো বছরের কষাঘাতে ভেঙে গেল বাঙালির মাজা।
বোন প্রীতিলতা, সূর্য, বিনয়, তিতুমীর গেল লড়ে–
অবশেষে তারা চলে গেল এই দেশটাকে ভাগ করে।

দুঃখের যেন শেষই হয় না, আবার দুঃখ আসে
দুখি বাঙালি আটকিয়ে গেল পাকিস্তানের ফাঁসে।
ভাষা যায় যায়, আশা যায় যায়, নিচু হয়ে যায় শির;
অভয়বারতা শোনান তখন বাঙালির মহাবীর।
মুক্তির দূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে–
মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে বাঙালি ছুটতে থাকে।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য; সাহসী মুক্তিসেনা...
মুক্ত না করে স্বদেশ ভূমিকে ঘরে তারা ফিরবে না।

নয়টি মাসের যুদ্ধের শেষে নতুন সূর্যোদয়ে–
আসলো বিজয় তিরিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে।

বিজয়ের আকাশ

প্রণব মজুমদার

ভোরের আকাশে বিজয়ের আলো দেখে
একে একে দামাল ছেলেরা ঘরে ফেরে।

অবুঝ ছিলাম, বাবা বলেন ‘বিজয়’
দিদি বলেন, বিজয় মানে স্বাধীনতা!
স্বাধীনতা মানে কী, যা খুশি তাই করা?
দানবের মতো করি দমন, হনন!

বিজয়ের ভালোলাগা বুঝিনি সেদিন
তুমিও দেখি ভোরের আকাশটা খুঁজো;
মানুষের ভালোবাসায় কাতর হও।
আশায় থাকি কবে আসবে সেই দিবস।

সুখের কোকিল এখনও গায় গান;
ভোরের মতো প্রাণ খুঁজে ফেরে বিজয়।

লাল-সবুজের দেশে বীরেরাই থাকে,
বিজয়ের বেশে কাদামাটির আদলে।

জনকের ডাকে

সাঈদ তপু

সাহসিকতার শিখরে উঠে জাগালেন তিনি ডেকে
আয় রে তোরা ভিনদেশিদের তাড়াবো স্বদেশ থেকে

নইলে লুটেরা আহার, বস্ত্র– কেড়ে নিয়ে যাবে সব
নিঃস্ব ঘরে থাকবে না কভু হাসি আর কলরব

পরাধীনতার কঠিন প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেবো আজ
হাতে হাত রেখে শপথ নিলে নয় তা কঠিন কাজ

এসো ভাই সব ভাঙবো ওদের শাসনের বেড়িবাঁধ
আর দূরে নয় রাখবো এবার সকলের কাঁধে কাঁধ

এমনি করেই জনকের ডাকে ভেদাভেদ সব ভুলে
দেশের মানুষ জন্মভূমির দায় কাঁধে নিলো তুলে

মৃত্যুর ভয় ভুলে গিয়ে তারা খুলে ফেলে সব বাঁধন
সাহসের সাথে ন'মাস চলে যুদ্ধ জয়ের সাধন

অবশেষে ভাসে বীরের শোণিতে বিজয়ের তরিখানি
সে কথা নিয়ে কেন আজ এত চলে রশি টানাটানি?

পশুদের হাতে কত মা-বোনের সম্ভ্রম হয়েছে হানি
সে কথা নিয়ে কেন আজ এত কানাঘুষা, কানাকানি?

বঙ্গবন্ধুর ডাকেই স্বদেশ হয়েছিল অবমুক্ত
ছিলেন তিনি, আজও রয়েছেন– এ মাটির সাথে যুক্ত।

বিজয় গাথা ইতিহাস

বেগম শামসুন নাহার

সহসাই মনে পড়ে গেল আজ–
দুঃখ-সুখের স্মৃতি অমলিন একরাশ,
লোক বলে আগুন ঝরা উত্তাল মার্চ, ১৯৭১ সাল,
জাতির পিতার সেই সাত তারিখের আলোড়িত–
মুক্তির সনদ– মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি আর–
বাংলার আপামর জনতা–
হাতে তুলে নিয়েছিলাম লাঠি-বাঁশ, অস্ত্র-শস্ত্র,
গোলা-বারুদ-সহায়ক সম্বল।
শুরু হলো 'মুক্তিযুদ্ধ' যেন এক দক্ষ-যজ্ঞ শেষে–
ষোলোই ডিসেম্বর– ১৯৭১ সাল–
ছিনিয়ে এনেছি বিজয়, পেয়েছি স্বাধীনতার সম্মান
বাংলার বুকে উড়েছে লাল-সবুজের পতাকা
মুখরিত প্রাঙ্গণ, লক্ষ শহিদের রক্তে রঞ্জিত বাংলার গৌরব।
তবুও আনন্দ-অশ্রু ধারায় সিক্ত হলো কোটি প্রাণ
আমরা পেলাম সোনার বাংলা গড়ার রূপকার,
মাঠঘাট, পাহাড়-প্রান্তরজুড়ে, বিজয় গাথা ইতিহাস
বিশ্ব নেতারা, ঘন ঘন করতালিতে জানালেন কৃতজ্ঞতা,
কল্যাণীয়া বার্তায় লিখলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের নাম– আর
সাহসী সেই, বীর বিপ্লবী সেই চিরঞ্জীব সেই–
জনতার মহান নেতা কীর্তিমান,
বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান
শেখ মুজিবুর রহমান।
সাধিতে বড়ো সাধ জাগে, যদি ফিরে আসো বার বার
বাংলা মায়ের প্রয়োজনে,
চরণ ধূলিতে তব করিব স্নান
হবো নাকো ম্রিয়মাণ।

মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে বাংলাদেশ

বাবুল তালুকদার

চারদিকে বুলেটের আওয়াজ
যায় থেমে থেমে গুলি বর্ষণ
একেরপর এক গুলি চলে মুক্তিযোদ্ধার।
অত্যাচার, নির্যাতন, বর্বরতা চলে পাকবাহিনীর
নয়টি মাস যুদ্ধ চলে বাংলার বুকে প্রতিমুহূর্ত–
এ দেশের মানুষ দেশ মাতৃকার টানে
ঝাঁপিয়ে পরে যুদ্ধের ময়দানে
রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, ছিনিয়ে আনে
একটি বিজয়, একটি স্বাধীনতা
একটি লাল-সবুজের পতাকা।
কত মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছে এই মাটিতে
মানুষ আজও ভুলতে পারেনি একাত্তরের কথা
লাশের গন্ধ আজও বয়ে যায় দেশ প্রান্তে
শহিদ মায়ের চোখে আজও নোনা পানি ঝরে
এই সোনার বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের মুখ ছবি

জগলুল হায়দার

দেখতে পারো ফুল ফসল আর
দেখতে পারো নদী
বাংলাদেশের সবুজ গাঁয়ে
চরণ ফেলো যদি।

ঘাসফড়িঙের চপল চলা
মেঘের মাথায় চন্দ্রকলা
জোছনা ঝরা রাত,
দেখতে পারে অবাক চোখে
পাতায় শিশির পাত।

দেখতে পারো নীলের মিছিল
শুভ্র আকাশ পানে
দেখতে পারো হাজার পাখি
মাতাল কেমন গানে।

দেখতে দেখতে দেশের ছবি
হতেও পারো মুখর কবি
ভাবের কলম খুলে,
লিখতে পারে সেসব কথা
হঠাৎ মনের ভুলে।

মনের ভুলে রবির মতো
কিম্বা দুখু কবির মতো
তুমিও কবি বনে,
বাংলাদেশের মুখ ছবিটা
এঁকেই রাখো মনে।

মুজিবুর রহমান

জাহানারা জানি

বছর ঘুরে প্রতিবছর এই যে ১৬ই ডিসেম্বরে
বিজয় খুশির দিনটি আসে সব বাঙালির
ঘরে ঘরে।
সন্ধ্যাবাতি ধরিয়ে হাতে মা বসাতো বারান্দাতে
আমরা ছোটো ভাই-বোনেরা বসে মায়ের পাশে
শুনতে চেতাম ক্যামন করে বিজয় এলো
এই আমাদের দেশে?
গল্প শুরু, ফুটছে বোমা, চলছে গুলি
পুড়ছে বাড়িঘর।
বিশাল বিশাল দৈত্য মানব দেখতে ভয়ংকর।
বাঁচলো যারা পালিয়ে গেল
বর্ডার হয়ে পার,
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন
ভারতের সরকার,
থাকা-খাওয়ার জায়গা দিলেন।
যুদ্ধ করার রসদ দিলেন,
মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং দিলেন হঠাও হানাদার
ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা দিলেন তাজা প্রাণ।
দুই লক্ষ মা-বোনেদের ছিল অবদান।
সবাই মিলে যুদ্ধ করে হটিয়ে হানাদার
খুলে দিলেন বাংলা মায়ের
স্বাধীনতার দ্বার।
কে জাগালো এত সাহস
কার সে অবদান
তিনি হলেন জাতির পিতা
শেখ মুজিবুর রহমান।

বিজয়ের হলো পূর্ণ বয়স

সেহাঙ্গল বিপ্লব

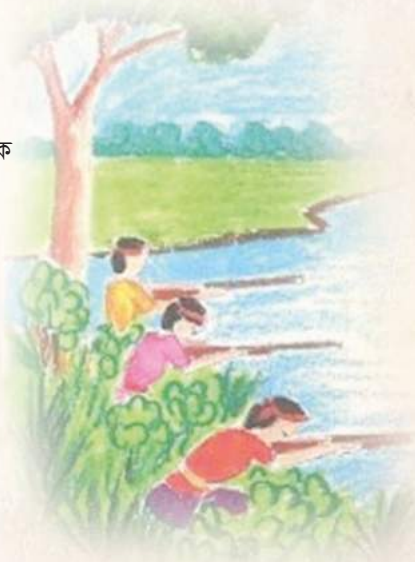

শহিদ বেদিতে বিজয়ের ফুল
বিজয় এসেছে ঘরে
শহিদি রক্ত পতাকার লালে
আমাদের মনে পড়ে।
মনে পড়ে নাম না জানা অনেক
বীর শহিদের স্মৃতি
তাঁদের স্মরণে জাগ্রত হউক
অন্তরে মহাপ্রীতি।

সমর যুদ্ধে কাঁপেনি কখনও
সাহসী বুকের পাটা
পাকিস্তানিরা ছিটিয়ে রাখত
'রাজাকার' নামের কাঁটা।

সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে
বিজয় এসেছে বাড়ি
মায়ের পরনে জড়িয়ে দিয়েছে
লাল-সবুজের শাড়ি।

বিজয়ের হলো পূর্ণ বয়স
অর্ধ শতক এবার
সময় এসেছে সমূলে ঘাতক
কাঁটাগুলো ছেঁটে দেবার।

সেই বিজয়ে

কামাল হোসাইন

ফুলটা ভীষণ মলিন ছিল ভোমর ছিল গোমড়া
কেন তারা অমন ছিল বলতে পারো তোমরা?
নদী ছিল শুকনো খাঁ খাঁ ছিল না তার নাব্য
কেমনে তারা গড়বে তবে ছলছলানি কাব্য?

পাখির ঠোঁটে গান ছিল না ডাকত না কেউ তেমনি
মনের সুখে ডাকলে আহা হৃদয় ভরে যেমনি।
গাছগাছালি হারায় সতেজ হারায় সবুজ মাঠটা
কোলাহলে মুখর থাকা থুবড়ে থাকে হাটটা।

এই মানুষের সুখ ছিল না বিষাদভরা মনটা
যাচ্ছিল সব থিতিয়ে সবুজ বিশাল আয়োজনটা।
যেই দেশে সে বসত করে তার পায়ে যে শৃঙ্খল
পাকিস্তানি বর্গি এসে বাজায় বিনাশ বিউগল।

মানুষ কি আর থাকবে বসে? তুলল গড়ে ঐক্য
জান যাবে যাক, দেশ বাঁচাবে, এটাই তখন লক্ষ্য।
প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে ছেলেবুড়ো সব্বাই
কেউ থাকে না ঘরে বসে রহিম রাজন রব ভাই।

নয় নয়টি মাস যুদ্ধ করে বাংলা হলো মুক্ত
সেই বিজয়ে বীর বাঙালি সবাই ছিল যুক্ত।

শোক হোক শক্তি

অমিতাভ মীর

শোক প্রকাশের ছলনায় উৎসব উন্মাদনায়,
এক শ্রেণির স্বার্থবাদীদের উত্থান ঘটছে অবলীলায়।
আর নয় শোক প্রকাশ, এবার শক্তির উদ্ভাস চাই–
আর নয় অশ্রুপাত, এবার আদর্শের বিকাশ চাই!
অশ্রু-জলের অনর্থ ধারায় কেন করো তাঁকে রিক্ত?
প্রাত্যহিক প্রার্থনার করুণা ধারায় করো তাঁকে সিক্ত।

কী আছে লৌকিক ওই শোক পালনের যুক্তি?
জেনে রাখো, তাঁর আদর্শের মাঝে রয়েছে জাতির মুক্তি!
ফিকিরের ফেরিওয়ালারা গোনে বর্ষের পর বর্ষ–
আজও জানে না, কী ছিল সে মহান নেতার আদর্শ!
স্বপ্ন ছিল তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার–
স্বাধীনতা, অভেদ জাতি, সার্বভৌমত্ব, নাগরিক অধিকার,
গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি;
এদের কোনটি বাস্তবায়িত হয়েছে? কী দেখাবে যুক্তি?

শোক-বিড়ম্বিত জাতি চিরকাল থেকে যাবে হতবল,
শোক ভোলো, আদর্শকে আঁকড়ে বাড়াও মনোবল!
সেই মহান নেতার প্রতি থাকে যদি বিন্দু পরিমাণ ভক্তি–
তবে, আর নয় ছিচ-কাঁদনের অভিনয়, শোক হোক শক্তি।
বক্তৃতা-বিবৃতি-অশ্রুপাতের ছলনা আর নয়,
স্বার্থসিদ্ধির লৌকিক শোক প্রকাশ কখনো নয়।

শোক থেকে জাতির অমিত শক্তির উদ্ভাস চাই,
বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাই,
বিভাজনের বিহ্বলতা নয়, শক্তিশালী ঐক্য চাই;
অসুস্থ ধারার নয়, মূলধারার অমল রাজনীতি চাই।
শুরু হোক তবে, পিতার আদর্শ বাস্তবায়নের পালা,
প্রতিষ্ঠা করো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা!

ধলেশ্বরীর হৃদয় ১৯৭১

শামীমা চৌধুরী

আর কয়েক পা এগুলেই ধলেশ্বরীর হু হু হৃদয়
ধলেশ্বরীর কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছো?
এই তো খোকন, আরেকটু দূরে
ধলেশ্বরীর অনেকটা কাছাকাছি আমরা!
ধলেশ্বরী নদী, নদী নয় নদীর রেখাচিত্র
চোখের পানি ঝরতে ঝরতে ধলেশ্বরী
এখন অন্ধ, কেবল কাদামাখা এক
রেখার ভেতরে গুটিয়ে থাকা।
হ্যাঁ, ঠিক এইখানে তোমার জন্য
অপেক্ষা করে আছে তোমার পরিচয়, গৌরব
যা তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছো উনপঞ্চাশ বছর ধরে।
তোমার এই ঠিক বয়সের সমান
লুঙ্গি পড়া, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে কর্দমাক্ত এক যুবক
শত্রুভুক রাইফেল হাতে ক্রলিং করতে করতে
এইখানে হানাদারের গুলিতে বেহেশতের
ফুল হয়ে ঝরে পড়েছিল।
নদীর তীরের ওই বয়সি বটবৃক্ষ, ওই
গলাগলি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি তালগাছ
পাশে সিঁদুরের আমগাছ ওরা সাক্ষী
সেই রক্তাক্ত প্রান্তরের
তুমি মাতৃজঠরের দুই মাসের ভ্রূণ
কেঁপে উঠেছিলে কি সেদিন?
তুমি কি ডাক শুনেছিলে স্বাধীনতার?
ঠিক এইখানে, ছুঁয়ে দেখ ধলেশ্বরীর
কাদামাখা হৃদয়,
তোমার স্পর্শে অবগুণ্ঠিত
মৃতপ্রায় ধলেশ্বরী জেগে উঠবে দু'কূল ছাপানো
উচ্ছ্বাসে, তোমার তারুণ্যের মতো।

হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু

আবদুল আলীম তালুকদার

সবুজ শ্যামল সোনার বাংলার প্রতি জন প্রতি ঘরে
যুগ যুগান্তরে শ্রদ্ধাভরে তোমাকেই যাবে স্মরে।
হৃদ মাঝারে তোমার অবয়ব আঁকা আছে স্মৃতিপটে
তুমি ছিলে সারাটি জীবন জাতির দুর্যোগ-সঙ্কটে।
তোমার বজ্রকঠিন হুংকার আজও বাঙালির জাগায় প্রাণ
তুমিই শেখালে মজলুম জাতিরে সংগ্রাম-স্বাধীনতার গান।
তোমার উত্থিত তর্জনী জাগায় শত্রুর মনে ভীতি
শিখিয়েছো তুমি জাত-পাত ভুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।
গেঁথে আছো তুমি বাঙালির হৃদয়ে থাকবে জনমভর
স্বপ্নলোকেও শুনি কান পেতে তোমার দরাজ কণ্ঠস্বর।
তোমার গড়া এই বঙ্গভূমি ফলে ফুলে শ্যামল ও সজীব
তোমার কীর্তি দেবো না মুছিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

আসবে খোকা ফিরে

এম ইব্রাহীম মিজি

ঘুমিয়ে গেল আমাদের খোকা শান্ত সুবোধ বেশে
বুলেটের তরে বুক পেতে দিলো দেশকে ভালোবেসে,
সেই খোকার নাম মনে পড়লে কাঁদি দিন রজনী
বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা ছিল যাঁর সহধর্মিণী।

খোকার অবদান এই জাতি ভুলবে না কোনোদিন
জাতির হৃদয় মননে রবেন তিনি চির অমলিন,
সে খোকা ছিল মানবদরদি, দুঃখীর পরম প্রিয়
যদি পারো শ্রদ্ধা সম্মান তাঁর চরণে ঢেলে দিও।

খোকারা রবে যুগে যুগে মহানায়ক আমরণ মরণে
খোকার নামটি হৃদয়ে গেঁথে অশ্রু ফেল স্মরণে,
এমন খোকারা বাংলার বুকে একবারই জন্ম নেয়
জাতির মুক্তির জন্য যাঁরা বুকের রক্ত ঢেলে দেয়।

এ খোকা আর কেউ নয় আমাদের জাতির পিতা
যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি বাংলার স্বাধীনতা,
প্রিয় খোকার দু'চোখে ছিল হাজারও স্বপ্নে ঘেরা
সে স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিয়ে তাঁর কন্যা সর্বসেরা।

তিনি হলেন মোদের খোকা লাখো কোটি বাঙালির
তাই তিনি বাঙালি জাতির পিতা মহাকালে মহাবীর,
বাংলার জনতা প্রতীক্ষায় কাঁদে খোকা ফিরে আয়
খোকার বিরহে হাজারও জনতার অশ্রু বয়ে যায়।

এমন খোকা খুব বেশি নেই কোটিতে একজন হয়
মুজিবুর তুমি শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাস সে কথাই কয়,
তোমার স্বপ্নে তোমারি ধ্যানে আমায় রেখেছে ঘিরে
শাশ্বত সত্য কালে-মহাকালে খোকা আসবে ফিরে।

বিজয় মানে

সত্যজিৎ বিশ্বাস

'বাংলায় বলা, বাংলায় চলা, বাংলা হবে আগে'
বাঙালির গলায় স্লোগান ওঠে, দেশের স্বপ্ন জাগে।
হায়েনার দল প্রতিশ্রুতি দেয় হচ্ছে-হবে-দেখি,
দেখাদেখি সব মুখের বুলি, সবটাই ছিল মেকি।
একাত্তরের পঁচিশে মার্চ ঘুমন্ত জাতির বুকে
নির্বিকারে চালায় গুলি, বেয়নেট বসায় বুকে।
ওরা ভেবেছিল, ভীতু বাঙালি, এতেই হবে শেষ,
অস্ত্র নেই, বস্ত্র নেই, চাইছে আবার দেশ!
জানত না ওরা, বীর বাঙালির আসল শক্তি মনে,
দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে, বিজয়ের দিন গোনে।
চাল ছিল না, চুলো ছিল না, মনেতে ছিল ঝড়,
মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে আনে ১৬ই ডিসেম্বর।
বিজয় আসে এক নদী লাল রক্তের দাম দিয়ে
বিজয় আসে চোখের জলে নতুন পতাকা নিয়ে।
বিজয় মানে অকাতরে প্রাণ, বাংলা মায়ের টানে;
লাল-সবুজের বিজয় নিশানে খুঁজি বিজয়ের মানে।

মহান বিজয়

গোলাম নবী পান্না

দেশটা স্বাধীন হলো এবং
বিজয় ফিরে এলো
জাতি নতুন মানচিত্র
গর্ব করে পেলো।

সেদিন জাতি লড়েছিলো
স্বাধীনতা চেয়ে
খুশির জোয়ার বইছে আজ
বিজয়টাকে পেয়ে।

আত্মত্যাগের বিনিময়ে
মহান বিজয় আঁকা
এই বিজয়ের পতাকাটা
আঁকড়ে ধরে থাকা।

আমার দেশ

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

অরূপ রূপা এই দেশেতে
শ্যামল গাছের ছায়ে
রাখাল বসে বাজায় বাঁশি
মধুর ঝংকারে।
সবুজ আমার মায়ের পরশ
ধূসর মাটির পরে
শাপলা-শালুক-পদ্ম-কুসুম
ফোটে বিলে ঝিলে।
মাটি সে যে পরশ পাথর
বুনে সোনা দানা
ধানের শিষে ঢেউ খেলে যায়
মৌসুমি আনাগোনা।
সর্ষে ফুলে রং ধরেছে
হলুদ মাঠের পরে
শিশির সিক্ত দূর্বা ঘাসে
রংধনু যায় ঝরে।
পাল তোলে ঐ নৌকাগুলো
এদিক সেদিক যায়
দাঁড় টেনে ঔই মাঝিমাল্লা
ভাটিয়ালি গায়।
দিনের শেষে অস্ত রাগে
পাখিরা যায় উড়ে
কোন সুদূরে বাসা তাদের
ঘর ছাড়াতো নয়।
এই দেশেরই গাছের শাখে
গড়ে তাদের নীড়
সকাল সাঝে উড়ে এসে
করে তারা ভিড়।
বকের সারি মাছ ধরিতে
বসে জলের পর
চাঁদ যেন ঐ জলের ভেতর
দুলছে অবিরল।

প্রিয় জন্মভূমি

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

এই যে পাহাড় বনভূমি
এই যে নদীর দেশ
সবুজ-শ্যামল গাঁয়ের ছবি
দেখতে লাগে বেশ।
পাহাড়-পর্বত, নদনদী আর
বন-উপবন যত
এই দেশের-ই গাছে গাছে
ফোটে যে ফুল কত।
সোনার আলো ফুটে যখন
নীল আকাশের গায়
সাত সকালে চাষি যখন
ধানের ক্ষেতে যায়।
ছায়া ঘেরা তরুলতা
বাঁশের বাগান যত
পূর্ণিমার-ই চাঁদের আলো
ঝরছে অবিরত।
আঁকাবাঁকা মেঠো পথে
বাউল গান গায়
এমন সুন্দর দেশটি দেখে
প্রাণ জুড়িয়ে যায় ।
সবুজ-শ্যামল দেশটি খুঁজে
কোথায় পাবে তুমি
কী অপরূপ দেশটি আমার
প্রিয় জন্মভূমি।

আমাদের জাদুকর

অমিত কুমার কুণ্ডু

ওই আসে দেখো জাদুকর এক প্রবল জ্যোতির্ময়
চারদিকে জয় ডঙ্কা বাজছে নেই নেই কোনো ভয়।
সেই জাদুকর আলোতে রাঙাবে দীর্ঘ অন্ধকার
তাঁর ছোঁয়া পেয়ে ভেঙে শেষ হবে শোষকের কারাগার।
চাঁদ সূর্যের জ্যোতি নিয়ে এলো দুখি বাঙালির ঘরে
আয় রে খোকাকে করব বরণ বাকি কাজ হবে পরে।
এই আহ্বান আজকের নয়, অনেক বছর আগে
করেছিল জানি পূর্বপুরুষ প্রেমপ্রীতি অনুরাগে।
তখন এদেশ পরাধীন ছিল ভিনদেশিদের হাতে
নীলকরদের নিপীড়নে থাকি শঙ্কিত দিনে-রাতে।
সেই কালো যুগে আলো হয়ে আসে একটি আলোক অসি
সেই তো আমার শেখ মুজিবুর সেই তো সূর্য শশী।
সেই শিশু ক্রমে বড়ো আরো বড়ো সূর্য সমান হয়ে
স্বাধীন দেশের বিজয় পতাকা আনল স্বদেশে বয়ে।
মুজিবের ডাকে আমরা স্বাধীন গর্বিত নরনারী
বিজয় আনতে এক নদী লাল রক্ত দিয়েছি পাড়ি।
মুজিবের ডাকে পরাধীন থেকে স্বাধীন স্বদেশে হাসি
সকলের প্রিয় বঙ্গবন্ধু, তোমাকেই ভালোবাসি।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বনেতা ও বহুমুখী গুণধর

মোহাম্মদ আলী

কেবল শুধু বাঙালির নয়,
বাংলা নয়, তুমি ছিলে–
গোটা বিশ্বের বিস্ময়,
বক্তৃতা ভাষণে মহাজাদুকর–
তুমি সুকান্ত, তুমি জীবনানন্দ,
তুমি বিশ্বকবি রবীন্দ্র।
তুমি বিদ্রোহী কবি নজরুল,
তুমি পল্লিকবি জসীমউদদীন–
তুমি যতীন্দ্র মোহন বাগচী।
তুমি মাইকেল মধুসূদন,
তুমি হোমার, তুমি গ্যাটে, তুমি দান্তে–
তুমি নগুছি, তুমি তুলসী দাস।
তুমি ওমর খৈয়াম, তুমি শেখ সাদি।
তুমি শেকসপিয়ার, তুমি বায়রন।
তুমি জর্জ ওয়াশিংটন
তুমি হয়ত আব্রাহাম লিংকন–
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
তোমার মহাপ্রতিভা অনলবর্ষী আলোকোজ্জ্বল
ধূমকেতুর ঐপূচ্ছ পেগাম ও ছায়া–
বাঙালি জাতিকে দিয়ে গেছো মায়া
স্বাধীনতার জয়ধ্বনি জয়গানের রূপরেখা।
কত যে বেদনায় হাহাকারে ভরা,
বাংলাদেশে আজি যা দেখা যায়–
এই সকল হে মুজিব তোমারই অবদান।
দেশপ্রেম স্বজাতিকে তুমি দিয়ে গেছ–
গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা
ভালোবেসেছো তাঁরই অবদান থাকবে
যুগে যুগে তাঁরই প্রতিদান।
তুমি ছিলে নাকি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ রাশির
আলোকোজ্জ্বল মহাজ্ঞানে মহাজ্ঞানী
সৎসাহসী শিক্ষাজ্ঞানে উদ্‌গীরণ–
ঝিলমিল ঝিলিক উজ্জ্বল জলন্ত প্রদীপ শিখা।

মুক্তির পথে হাঁটতে থাকে

রকিবুল ইসলাম

আমার ভাষায় আমি পারবো না কথা বলতে!
আমার চিন্তায় আমি পারবো না পথ চলতে!
এ কেমনতর দুঃশাসন!
এ কেমনতর বন্দিজীবন!

বাধা পেতে পেতে... যেতে যেতে...
আটকে যাই মায়াবী আলপথে।

আমি মানি নাকো এই দুঃশাসন!
আমি মানি নাকো এই বন্দিজীবন!
আমি মানুষের মতো বলতে চাই, চলতে চাই।

অবরুদ্ধ এই অবলা জীবন...
মুক্তির পথে হাঁটতে থাকে বাংলাদেশ
স্বাধীনতার পথে হাঁটতে থাকে বাংলাদেশ।
মা-মাটির ভালোবাসার পথে হাঁটতে থাকে বাংলাদেশ।

রক্তে কেনা বিজয়

শচীন্দ্র নাথ গাইন

রক্তঝরা তারিখটা আজও রং ধরে থাকে লাল,
ছিন্ন করেছে এদিন বাঙালি খুনি পাকিদের জাল।
বর্বরেরা কেড়ে নিয়েছিল মাটি-মানুষের সুখ,
অস্ত্রের ঘায়ে খালি করে তারা অগণিত মার বুক।

বোনের সম্ভ্রম লুট করে ওরা বাড়িয়ে দিয়েছে শোক,
ব্যথাবেদনায় পাথর বাবার জলহীন দুটো চোখ।
মাঠঘাট নদী খালবিল ভাসে শুধু রক্তের ঢল,
পাষাণেতে গড়া হৃদয় ওদের ব্যবহারে ওরা খল।

আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে তছনছ হয় বাড়ি,
লুটপাট করে সোনাদানা আর টাকা নেয় কাড়ি কাড়ি।
এদেশের ধনসম্পদে বাড়ে শুধুই ওদের লোভ,
দুরাচারীদের ঘৃণ্য আচারে জমা হতে থাকে ক্ষোভ।

প্রতিরোধে তাই ফুঁসে ফুঁসে সব গর্জে উঠেছে বীর,
অগ্নিশপথে যুদ্ধে নেমেছে, ভয়ে ভীরু অস্থির।
আত্মত্যাগের মহিমা জড়ানো অবশেষে আসে জয়,
লাখো জীবনের বিনিময়ে পাওয়া এইদিন অক্ষয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১১ই নভেম্বর বঙ্গভবনে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স ২০২১-এ অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যায় বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়

ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে বলে জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, সরকার বিগত এক যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ– কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইড কমে আসছে।

১১ই নভেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলনের ২৫তম আসর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি 'ডব্লিওসিআইটি ২০২১' এবং 'অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিট ২০২১'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম কমানো, অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল যন্ত্র হাতের নাগালে আনার পাশাপাশি মানুষের হাতের মুঠোয় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জনগণ এখন ঘরে বসেই দুই শতাধিক নাগরিক সেবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাচ্ছে। তিনি বলেন, ২০২১ সাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অনন্য ও স্মরণীয় বছর। এ বছর আমরা একইসঙ্গে উদ্‌যাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ বছরই পূরণ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার। এমনই এক শুভক্ষণে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির ২৫তম আসর।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ২০২১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলনের ২৫তম আসর 'ডব্লিওসিআইটি ২০২১'-এর আয়োজক বাংলাদেশ। এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। এ আয়োজন অবশ্যই বাংলাদেশে আইসিটি খাতের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য– 'আইসিটি দ্য গ্রেট ইকুয়ালাইজার' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। ২০০৯ সালে দেশের মাত্র ৮ লাখ মানুষ ইন্টারনেট সেবা পেতো। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ কোটির বেশি। এসময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে চারগুণের বেশি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই করোনা মহামারির দুঃসময়ে। মহামারি মোকাবিলায় সবচেয়ে নির্ভরশীল মাধ্যম হয়ে ওঠে তথ্যপ্রযুক্তি। দেশের শিক্ষা কার্যক্রম, বিচারিক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকিং সেবা হয়ে পড়ে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। কোভিড-১৯ মহামারিকালে তথ্যপ্রযুক্তির স্থানীয় বাজার অকল্পনীয় প্রসার লাভ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেই দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখা হয়।

জনগণের কল্যাণে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান

দেশ ও জনগণের কল্যাণে আরও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১৩ই নভেম্বর কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

স্থানীয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি এর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া হাওরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষার ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, পর্যটকরা যাতে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের অংশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, 'মাছে ভাতে বাঙালি'– বাঙালির শাশ্বত এই পরিচয়েই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে মাছের গুরুত্ব। আর জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমা, উপকূলীয় এলাকা ও মোহনা ইলিশের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। সরকার মৎস্য খাতের বিশেষ করে ইলিশের বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এর উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির সুফল হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইলিশের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গৃহস্থের রান্নাঘরের গণ্ডি পেরিয়ে ইলিশ এখন ব্র্যান্ড হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরছে। ১১ই নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক ইলিশ, পর্যটন ও উন্নয়ন উৎসব ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ২১শে নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসের সশস্ত্রবাহিনী বিভাগে 'সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নানকে শান্তিকালীন পদক পরিয়ে দেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত নির্বাচিত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারদের দেওয়া সংবর্ধনা এবং ২০২০-২০২১ সালের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ শান্তিকালীন পদকপ্রাপ্ত সদস্যদের পদকে ভূষিতকরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গণভবন থেকে ঢাকা সেনানিবাসের সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে ভার্চুয়ালি অংশ নেন তিনি। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে, বিশ্ব মর্যাদায় বাংলাদেশকে আমরা আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছি। এই মর্যাদা ধরে রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ আমরা গড়ব। সরকার সশস্ত্রবাহিনীসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্য ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে অভিনন্দন জানান এবং পদক প্রদান করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এবং সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের খসড়া, ২০২০-২০২১ অর্থবছর সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন এবং জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০২১-এর খসড়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

একনেকে ১০ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৬ষ্ঠ একনেক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী ২৯ হাজার ৩৪৪ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ের ১০ প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ১১ হাজার ৩ কোটি ৩০ লাখ আর বৈদেশিক ঋণ ১৮ হাজার ৯৩২ কোটি ৪ লাখ টাকা।

বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ঢাকা-মালে সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ২৪শে নভেম্বর গণভবনে মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়সাল নাসিমের সঙ্গে বৈঠককালে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারলে দ্বিপক্ষীয় ব্যাবসাবাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বাংলাদেশ মানবসেবা ও স্বাস্থ্যসেবায় মালদ্বীপকে কারিগরি সহায়তা দিতে পারে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

চরের সব মানুষকে দ্রুত বিদ্যুৎ দেওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের বাইরে থাকা চর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলোকে দ্রুত বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার নির্দেশ দেন। ২৬শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া জানান, রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের কয়েক হাজার পরিবার এখনো বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে থাকার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে এলে তিনি এ নির্দেশনা দেন। তিনি দ্রুত কাজ করার এবং প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প নেওয়ারও পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো বাড়ি বা পরিবার অন্ধকারে থাকবে না। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী শতভাগ মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় আনার যে লক্ষ্য, তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। এটা বাস্তবায়ন হলেই সরকারের দেওয়া শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

অতীতের বীরত্বগাথা স্মরণ রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে অতীতের বীরত্বগাথা স্মরণ করতে হয়, বীরদের সম্মান জানাতে হয়। ২৫শে নভেম্বর রাজধানী শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ আয়োজিত স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ধারণকৃত দুর্লভ চিত্রের তিনদিনব্যাপী প্রদর্শনী 'বাঙালির বীরত্বের চিত্রগাথা' উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রদর্শনী এবং এ উপলক্ষে অ্যালবাম প্রকাশের জন্য সশস্ত্রবাহিনী বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোকচিত্র খুব বেশি নেই এবং যদি সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। এগুলোকে সন্নিবেশিত করে একটি অ্যালবাম বের করে এটিকে সংরক্ষণের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাঙালির ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, পাঁচ হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে ১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। এর আগে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৭৮৬ সালে ফকির মজনু শাহ বিদ্রোহ করে, ১৮৩১ সালে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরি করে, ১৯৩০ সালে সূর্যসেন চট্টগ্রাম কারাগার লুণ্ঠন করে, ১৯৪৪ সালে নেতাজি সুভাষ বসু 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো' বলে স্বাধীনতার স্বপ্ন এঁকেছিলেন, স্বাধীনতা আসেনি। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করেছিলেন যে, দেশের তরে নিজপ্রাণ সঁপে দিয়ে বাঙালিরা যুদ্ধে গিয়েছিল, হাজারে নয়, লাখে লাখে মানুষ যুদ্ধে গিয়েছিল। ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এ সময় বলেন, শৈশবে আমি মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছি। দেখেছি আমার বসতবাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে, আমার গাঁওয়ের অনেককে হত্যা করা হয়েছে। আমার কচি রক্তে আগুন ধরেছে, আমারও মনে হয়েছে আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই। কিন্তু বয়স আমার প্রতিবন্ধক ছিল। আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরি মুক্তিযোদ্ধারা, সাধারণ জনগণ এবং আমাদের সশস্ত্রবাহিনী নিজের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যুদ্ধ করেছে। একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের জনযুদ্ধে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবার সম্মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে আমাদের এই বাংলাদেশ রচিত হয়েছে। আমাদের এই বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রচনার লক্ষ্যে রচিত হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পরপরই অনুধাবন করেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে বাঙালিদের মুক্তি নিহিত নয়। সে কারণে ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের আগে ১২ই আগস্ট তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন–১৪ই আগস্ট আনন্দ উল্লাসের দিন নয়, বরং উৎপীড়নের নিগড় থেকে মুক্তি পাবার শপথ পাওয়ার দিন, কারণ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাঙালির সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে, বাঙালির ভাষা কেড়ে নিতে চায়, সেই রাষ্ট্র বাঙালির জন্য নয়। এটি তৎকালীন *ইত্তেফাক* পত্রিকাসহ অনেক পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল।

জীবন, সমাজ ও দেশ গঠনে কাজ করবে টেলিভিশন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, টেলিভিশন শুধু বিনোদন বা সংবাদের জন্যই নয়, টেলিভিশন জীবন, সমাজ ও দেশ গঠনে কাজ করবে– সেটিই হোক বিশ্ব টেলিভিশন দিবসে আমাদের লক্ষ্য। ২১শে নভেম্বর বিশ্ব টেলিভিশন দিবস উপলক্ষে বনানীতে একটি অভিজাত হোটেলে এসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স–এটকো আয়োজিত 'বাংলাদেশে টেলিভিশন চ্যানেলের বিকাশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৫শে নভেম্বর ২০২১ শিল্পকলা একাডেমিতে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ধারণকৃত দুর্লভ ছবিসমূহের প্রদর্শনী 'পোর্টফোলিও'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বিশ্ব টেলিভিশন দিবসে বৈঠক আয়োজনের জন্য এটকোকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আগে একটি টেলিভিশন ছিল, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। আজকে একে একে ৩৪টি টেলিভিশন সম্প্রচারে আছে, আরও কয়েকটি প্রস্তুতি নিচ্ছে, ৪৫টির লাইসেন্স দেওয়া আছে। সাংবাদিক, কলাকুশলী ছাড়াও টেলিভিশন শিল্পে সবমিলিয়ে প্রায় লাখখানেক মানুষ যুক্ত। আরও অনেকেই কন্টেন্ট ও বিজ্ঞাপন বানায় ও বিক্রি করে। প্রায় পাঁচ কোটি বাড়িতে টেলিভিশন আছে। প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষটিও একটি সময় একটু হলেও টেলিভিশন দেখেন, আমিও দেখি। সবকিছু দেখার সময়-সুযোগ হয় না, খবর দেখি।

টেলিভিশন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপগুলো নিয়ে তিনি বলেন, অনেক সমস্যা সমাধান হয়েছে এবং অনেক সমস্যা আছে। বাংলাদেশে বিদেশি যে-কোনো চ্যানেল সম্প্রচার করতে পারে। তবে তাকে আইন অনুযায়ী ক্লিনফিড পাঠাতে হবে। ক্যাবল নেটওয়ার্কে টিভির ক্রম ঠিক ছিল না, এখন হয়েছে। ক্যাবল অপারেটররা নিজেরাই বিজ্ঞাপন দেখাতো, সেগুলো বন্ধ করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে এটি দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছি।

বিদেশি শিল্পীদের দিয়ে বিজ্ঞাপন বানালে শিল্পীপ্রতি দুই লাখ টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দিতে হবে। এতে আমাদের শিল্পীরা উপকৃত হবে উল্লেখ করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মানুষকে ভাবায়, কাঁদায় এমন অনেক দেশি বিজ্ঞাপন আছে। বিদেশি বিজ্ঞাপনকে ডাবিং করে এখানে প্রচার বন্ধ করার জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ে আলোচনা করেছি, পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ক্লিনফিড হওয়ার কারণে দেশের টেলিভিশন শিল্প যে পাঁচশো বা সাতশো কোটি টাকার বিজ্ঞাপন হারাতো সেগুলো এখন দেশের টিভিগুলো পাওয়া শুরু করেছে। দেশে টেলিভিশনগুলোর রেটিং বা টিআরপি একটা সংস্থা করত, অন্যান্য দেশে কীভাবে করা হয়, বিশেষ করে ভারতে কীভাবে করা হয়, অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি এবং খুব সহসা আমরা এতে শৃঙ্খলা আনব বলে জানান তিনি।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের সুপারিশ অনুমোদন

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) অনুমোদিত হয়েছে। ২৪শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সভায় এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়।

জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি এক টুইট বার্তায় এ প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি জানান। তিনি ঐ বার্তায় লিখেছেন, এটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প–২০২১-এর বাস্তবায়ন।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এক বিবৃতিতে এই ঐতিহাসিক অর্জনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এক মহান মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশ ২৬শে ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দ্বিতীয়বারের মতো স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছিল। সিডিপি একই সঙ্গে বাংলাদেশকে ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরব্যাপী প্রস্তুতিকালীন সময় দেওয়ার সুপারিশ করে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এরই মধ্যে সিডিপির সুপারিশ অনুমোদন করেছে। পাঁচ বছর প্রস্তুতিকাল শেষে বাংলাদেশের উত্তরণ ২০২৬ সালের ২৩শে নভেম্বর কার্যকর হওয়ার কথা।

বাংলাদেশই একমাত্র দেশ হিসেবে জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রস্তুতিকালীন সময় ছাড়াও বাংলাদেশ বর্তমান নিয়মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে ২০২৬ সালের পর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখাসহ মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নেতৃত্বে বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় নীতির কৌশল ও পদক্ষেপ প্রণয়ন করছে।

বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীর তালিকায় চুয়েটের দুই শিক্ষক

বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) দুই শিক্ষক। তারা হলেন– যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মোস্তফা কামাল ভূঞা এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইকবাল হাসান সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনির্ভাসিটি সম্প্রতি এলসেভিয়ার প্রকাশনার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের দুই শতাংশ গবেষণা বিজ্ঞানীর এই তালিকা প্রকাশ করে।

১৯৬৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ৬০ লাখ বিজ্ঞানীর প্রকাশনা, এইচ-ইনডেক্স, সাইটেশন ও অন্যান্য সূচক বিশ্লেষণ করে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দৈহিক নিরাপত্তার বিষয়টি সংসদে বিল পাস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দৈহিক নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত সংসদে বিল পাস হয়েছে। ১৬ই নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) বিল ২০২১ সংসদে পাসের প্রস্তাব করেন। পরে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এতে দুটি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিলটি সংসদে তোলেন মন্ত্রী। পরে বিল পরীক্ষা করে সংসদে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। ১৯৮৬ সালের একটি অধ্যাদেশ দিয়ে বর্তমানে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সামরিক আমলে প্রণীত ওই আইন বাতিল করে বাংলায় নতুন আইন করতে বিলটি পাস করা হয়। বিলে জাতির পিতার পরিবারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা এবং তাঁদের সন্তানাদি ও ক্ষেত্রমতো ওই সন্তানাদির স্বামী বা স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানাদি। আগের বিষয়গুলোকে আইনে রাখা হয়েছে। নতুন করে যুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্য ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দৈহিক নিরাপত্তা প্রদান। সরকারি গেজেট দিয়ে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরাও এই আইনের অধীনে নিরাপত্তা পাবেন।

বিলে বলা হয়েছে, এসএসএফের তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত থাকবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতার পরিবারের সদস্যরা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন এসএসএফ তাঁদের দৈহিক নিরাপত্তা দেবে। এসএসএফ কাজের প্রয়োজনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছেও সহায়তা চাইতে পারবে। যাদের কাছে সহায়তা চাওয়া হবে তাদের তা দিতে হবে বলেও বিলে বিধান রাখা হয়েছে। জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন ২০০৯-এ যাই থাকুক না কেন, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তল্লাশি, আটক ও গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে থানার একজন ওসির যেসব ক্ষমতা আছে, এসএসএফের একজন কর্মকর্তার এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সারা দেশে সেই ক্ষমতা থাকবে।

কার্প জাতীয় মাছ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের জীবনরহস্য উন্মোচন

দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের জীবনরহস্য উন্মোচন (জিনোম সিকোয়েন্স) করেছেন চট্টগ্রামের একটি গবেষক দল। হালদা নদী বাংলাদেশের কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ জিনোম বিন্যাস একটি খুবই কার্যকর পদ্ধতি। যার ফলে মাছের শারীরবৃত্তীয় গবেষণা সম্ভবপর হচ্ছে।

১৬ই নভেম্বর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরম জুমের মাধ্যমে কার্প জাতীয় মাছ ও ডলফিনের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন ও হ্যাচারি সম্বলিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্বে থাকা চবির হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রধান ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরীয়া বলেন, গাঙ্গেয় ডলফিনসহ কার্প জাতীয় রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশের জীবনরহস্য উন্মোচন বিশ্বে এটাই প্রথম।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

জানুয়ারি থেকে আন্তঃপরিচালনাযোগ্য ডিজিটাল লেনদেন মাধ্যম

আর্থিক লেনদেনে খরচ ও হয়রানি রোধে জানুয়ারিতে চালু করা হবে আন্তঃপরিচালনাযোগ্য ডিজিটাল লেনদেন মাধ্যম বা ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফরম (আইডিটিপি)। দেশের জনগণকে ডিজিটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে নিয়ে আসাই এর লক্ষ্য।

২১শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং ফর আনন্দমেলা প্ল্যাটফরম ইউজারস ইন বাংলাদেশ কিকঅফ ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, অনলাইন ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, এটিএম কার্ড ব্যবহার দেশে ই-কমার্সেরও ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত ই-কমার্সের আকার ছিল আট হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা করোনা মহামারিতে দ্বিগুণ হয়েছে। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে স্টার্টআপগুলোকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় ওয়েবসাইট ডেভেলপ ও মার্কেটিং করার লক্ষ্যে দেশের দুই হাজার ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাকে অফেরতযোগ্য ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে।

কোভিডে টেলিহেলথে প্রবৃদ্ধি ৩০০ শতাংশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, কোভিড সময়ে দেশে টেলিহেলথের বিকাশ ঘটেছে ৩০০ শতাংশ। ভিডিও কনফারেন্সিং, টেস্ট রিপোর্ট শেয়ারিং, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সেবা পেতে এই সময়ে গড়ে উঠেছে ১৩ হাজার কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক। এর ৯৮ শতাংশই সংযুক্ত হন মোবাইলে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২১শে নভেম্বর ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং ফর আনন্দমেলা প্ল্যাটফরম ইউজারস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক ওয়ার্কশপ-এ প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

গ্রাম-শহরের বৈষম্য ও দূরত্ব ঘোচাতে স্ট্যাবলিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইনস্টিটিউট ও সরকারি অফিসকে স্ট্রিমিং সুবিধায় আনতে দুই লাখ ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটি পয়েন্ট তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, নতুন প্রজন্ম যেন এআর, ভিআর, রোবটিকস, আইওটি ও ব্লক চেইন প্রযুক্তির মতো ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারে এজন্য দেশজুড়ে ৩০০ স্কুল অব ফিউচার স্থাপন করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১৮ই নভেম্বর তার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন এইচএসসি ২০২১ ও সমমানের পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন– পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, বছরে ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি আয় করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফ্রিল্যান্সিং কমিউনিটি বাংলাদেশের সাড়ে ছয় লাখের বেশি আইটি ফ্রিল্যান্সাররা। ১০ কোটি ৩০ লাখের বেশি হিসাব থেকে এক কোটি ১০ লাখের বেশি লেনদেন হয়। প্রায় ২ হাজার ই-কমার্স সাইট থেকে আয় হয় ২০ কোটি মার্কিন ডলার।

১৬ই নভেম্বর জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিষয়ক বিভাগের (ডিইএস) এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (ইএসসিএপি) যৌথ আয়োজনে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পলিসি এক্সপেরিমেন্টেশন অ্যান্ড রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স ইন এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এইচএসসি পরীক্ষা ২রা ডিসেম্বর, পরীক্ষার্থী প্রায় ১৪ লাখ

দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এ বছর পরীক্ষার্থী মোট ১৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬৬৪ জন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৭ লাখ ২৯ হাজার ৭৩৮ জন ও ছাত্রী ৬ লাখ ৬৯ হাজার ৯৫২ জন।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও ইতিবাচক পরিবেশে সম্পন্ন করতে ১৮ই নভেম্বর সচিবালয়ে জাতীয় মনিটরিং ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর তত্ত্বীয় বিষয়ে পরীক্ষা আগামী ২রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩০শে ডিসেম্বর শেষ হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বীয় বিষয়ের পরীক্ষা ২রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৯শে ডিসেম্বর শেষ হবে। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বীয় বিষয়ের পরীক্ষা ২রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৮ই ডিসেম্বর শেষ হবে।

উল্লেখ্য, ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসিতে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ১৭ জন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় ১ লাখ ১৩ হাজার ১৪৪ জন ও কারিগরিতে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫০৩ জন অংশ নেবে। এছাড়া, বিদেশের ৮টি কেন্দ্রের মোট পরীক্ষার্থী ৪০৬ জন।

মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে। অনিবার্য কারণে কোনো পরীক্ষার্থীকে এরপরে প্রবেশ করতে দিলে তাদের নাম, রোল নম্বর, প্রবেশের সময়, বিলম্ব হওয়ার কারণ ইত্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে ওই দিনই সংশ্লিষ্ট বোর্ডে প্রতিবেদন দিতে হবে।

ট্রেজারি থেকে নির্দিষ্ট তারিখের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সব সেট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে এসএমএস-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রশ্নপত্রের সেট কোড জানিয়ে দেওয়া হবে।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল ফোন/ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছবি তোলা যায় না– এই রকমের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীদের এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য সময় ১০ মিনিট বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসি) পরীক্ষার্থীদের সময় ২০ মিনিট বাড়ানোসহ শিক্ষক, অভিভাবক, সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সালের সংশোধিত ও পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে গ্রুপভিত্তিক ৩টি নৈর্বাচনিক বিষয়ে ৬টি পত্রে পরীক্ষা হবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক নোটবুকের পাওয়া নম্বর অনলাইনে বোর্ডে পাঠাবে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যকার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ, মানবিক বিভাগ, ব্যাবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ না করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানিতে আবারও রেকর্ড

করোনাকালীন বিপর্যয়ের পর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত। অক্টোবরে ৪৭২ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৪২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সমান। স্বাধীনতার পর এক মাসে এত বেশি রপ্তানি আয় গত ৫০ বছরে আর কখনো করতে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগের মাসেও সর্বাধিক আয়ের রেকর্ড হয়েছিল। গত সেপ্টেম্বরে দেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪১৭ কোটি ডলারের, যা ছিল অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অক্টোবরে আগের মাসের রেকর্ড ভেঙেছে। এ মাসে যা আয় হয়েছে তা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। আগের বছরের অক্টোবরে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৯৪ কোটি ডলার। মাসভিত্তিক হিসাবে রপ্তানি বাড়ায় এটি সামগ্রিক আয়েও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে অর্থাৎ জুলাই-অক্টোবর সময়ে ১ হাজার ৫৭৪ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় এসেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। করোনাভাইরাস দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির জন্যও ডেকে এনেছে বিপর্যয়। সরকার নানা ধরনের প্রণোদনা দিয়ে অর্থনীতির গতি সচল রাখার চেষ্টা করছে দেড় বছর ধরে। রপ্তানি খাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি সে হতাশা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ এনে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনাকালে সারা দুনিয়ায় প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে সব দেশ। বাংলাদেশের পণ্যের প্রধান ক্রেতা ইউরোপ-আমেরিকার বাজার দেড় বছর পর ভালোভাবে উন্মুক্ত হওয়ায় রপ্তানিতে গতি এসেছে। বিশেষত পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারছে কম দামের কারণে। রপ্তানি বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিতে সুবাতাস প্রবাহিত করেছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উদার শিল্পনীতি গ্রহণ করেছে সরকার

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ উপযুক্ত স্থান। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উদার শিল্পনীতি গ্রহণ করেছে সরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

২৬শে নভেম্বর রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে সুরমা হলে জাপানের সনি কর্পোরেশন কোম্পানির 'বাংলাদেশে অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের ঘোষণা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব মো. শহীদ উল্লাহ খন্দকার। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শহীদ-উল মনির এবং রিজিওনাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি সনি সাউথ-ইস্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট আতসুশি এন্দো। সিঙ্গাপুর থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আতসুশি এন্দো স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডকে বাংলাদেশে সনির অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি নেতৃত্বে বাংলাদেশ আমদানিকারক দেশ থেকে ডিজিটাল পণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তর লাভ করেছে। ইতোমধ্যে স্যামসাং, নোকিয়া ও শাওমিসহ ১৪টি কোম্পানি বাংলাদেশে মোবাইল কারখানা স্থাপন করেছে। মেইড ইন বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের মোবাইল ও ল্যাপটপ এখন আমেরিকাসহ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন ২৬শে নভেম্বর সোনারগাঁও হোটেলে জাপানের সনি কর্পোরেশনের বাংলাদেশ অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের ঘোষণা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। আমরা কম্পিউটার ও ল্যাপটপসহ আইটি পণ্য রপ্তানি করছি। তিনি সনিসহ ডিজিটাল পণ্য উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠা সমূহকে বাংলাদেশে তাদের পণ্য উৎপাদনে সরকারের দেওয়া সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

প্রবাসীদের কৃষি খাতে বিনিয়োগের আহ্বান

১৫ই নভেম্বর লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিবিসিসিআই) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি এসময় ইউকে প্রবাসী ব্যবসায়ীদেরকে বলেন, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে বিনিয়োগের সকল সুবিধা রয়েছে। সে সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে প্রবাসী ব্যবসায়ীদেরকে দেশে বিনিয়োগের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কার্গো বিমান ভাড়া বেশি, স্ক্যানিং সমস্যা, কার্গো ভিলেজে কোল্ড স্টোরেজের সমস্যাসহ নানা সমস্যা তুলে ধরেন। এছাড়া, গ্লোবাল গ্যাপ (উত্তম কৃষি চর্চা) মেনে ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তারা কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদলের এ সফরের প্রশংসা করেন।

কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যবসায়ীদেরকে অবহিত করেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, রপ্তানি বৃদ্ধিতে আধুনিক কৃষি চর্চা মেনে ফসল উৎপাদন, রপ্তানি উপযোগী জাতের ব্যবহার, আধুনিক প্যাকিং হাউস নির্মাণ, অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন কাজ চলমান আছে।

মতবিনিময় সভায় লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, বিবিসিসিআই'র হেড অব এডভাইজরি বোর্ড শাহগীর বখত ফারুক, প্রেসিডেন্ট বশির আহমেদ, ডিরেক্টর রফিক হায়দার, পাথফাইন্ডারের সিইও ইফতি ইসলাম, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ভাইস প্রেসিডেন্ট শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এবং সফররত বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন চিকিৎসকদের ৫৫ শতাংশই নারী

চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়ার জন্য ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীরা বেশি আবেদন করছেন এবং মেধার জোরে এমবিবিএস কোর্সে মেয়েরাই বেশি ভর্তি হতে পারছেন। নতুন চিকিৎসক হয়ে যারা বের হচ্ছেন, তাদের মধ্যে নারীরা সংখ্যায় বেশি। সম্প্রতি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মেডিক্যালে ভর্তি ও এমবিবিএস পাস করা চিকিৎসকদের একটি পরিসংখ্যান তৈরি করেছে। আর এই পরিসংখ্যানেই এসব তথ্য উঠে এসেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে নারী-পুরুষ মিলিয়ে দেশে এমবিবিএস পাস করেছেন ৪৮ হাজার ৭৭৭ জন দেশি শিক্ষার্থী। এর মধ্যে নারী ২৬ হাজার ৯০১ জন, যা মোট শিক্ষার্থীর ৫৫ শতাংশ। সর্বশেষ ২০১৮ সালের হিসাবে এমবিবিএস পাস করেন ৮ হাজার ৫৪৭ জন। এর মধ্যে নারী ছিলেন ৫ হাজার ৬৬ জন বা ৫৯ শতাংশ। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, এমবিবিএস ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আবেদন করেছিলেন ৭২ হাজার ৯২৮ জন। এর মধ্যে আবেদনকারী ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন হাজারেরও বেশি।

মহাকাশ স্টেশনে যাচ্ছেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী

প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাচ্ছেন মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার নভোচারী জেসিকা ওয়াটকিনস। ২০২২ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম *এনবিসি নিউজ* প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বলে *প্রথম আলো* ২১শে নভেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জেসিকা একজন ভূতত্ত্ববিদ। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলস থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নেন তিনি। ২০১৭ সালে নাসার নভোচারী হিসেবে নির্বাচিত হন জেসিকা। তিনি চন্দ্র অভিযান প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত আছেন। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রথম নারী হিসেবে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেসিকা।

পাহাড়ি নারীরা এখন রেমিট্যান্স-যোদ্ধা

বাংলাদেশের অনেক নারী বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন কাজের খোঁজে। দেশের রেমিট্যান্স অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রাখছেন তারা। এর মধ্যে বর্তমানে হংকংয়ে প্রায় ৫০ জন পাহাড়ি নারী কর্মরত আছেন। তাদের মধ্যে মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গা,

খিয়াংয়ের সংখ্যা বেশি। হংকংয়ে তারা মূলত বয়স্ক নারী ও ছোটো শিশুদের দেখাশোনার কাজ করেন। বিদেশে থাকা এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারা পরিবারে, সমাজে ও দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছেন। পাহাড়িদের মধ্যে তারাই প্রথম বিদেশে গিয়ে এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ১৬ই নভেম্বর *প্রথম আলো* প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ১৭ই নভেম্বর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত জাতীয় কমিটি'র সভায় সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বাল্যবিয়ে হলে সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা পাবে না

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, কোনো পরিবারে বাল্যবিয়ে হলে সে পরিবার সরকারি সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা পাবে না। বাল্যবিয়ে কিশোরীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। বাল্যবিয়ের কারণে শিশু ও নারীর কল্যাণে গৃহীত সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী ১৭ই নভেম্বর ঢাকায় ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত জাতীয় কমিটি'র প্রথম সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০০৭ সালে ১৮ বছরের পূর্বে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৭৪ শতাংশ যা ২০১৭ সালে ৫২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। ২০০৭ সালে ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৩২ শতাংশ যা ২০১৭ সালে এই হার নেমে এসেছে ১০ শতাংশে। বাল্যবিয়ের হার দ্রুতই কমে আসছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ বাল্যবিয়ে মুক্ত হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বাল্যবিয়ে বন্ধে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ইমাম, ধর্মীয় নেতা, এনজিও প্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে বাল্যবিয়ে রোধ করতে ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, করোনা মহামারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার অর্থনীতিকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়ে ভারতসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যখন নেতিবাচক, সেখানে বাংলাদেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে।

২২শে নভেম্বর ঢাকায় সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্ট্যাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নীত হওয়া উপলক্ষে এক জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথির ভাষণে উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়া, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন করা। সে লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার।

সংলাপে তিনটি পৃথক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। প্রথম ভাগের অধিবেশন ছিল 'এলডিসি থেকে মসৃন এবং টেকসই উত্তরণের প্রস্তুতি', দ্বিতীয় ভাগে ছিল 'এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং কার্যকর উন্নয়ন সহযোগিতা' এবং সর্বশেষ তৃতীয় অধিবেশন ছিল 'এলডিসি থেকে উত্তরণ: বাণিজ্যের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ'।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিপণ্যে মুনাফার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিলো সরকার

কোনো কৃষিপণ্যে সর্বোচ্চ কত লাভ করা যাবে–তা বেঁধে দিয়েছে সরকার। কৃষিপণ্যের সর্বোচ্চ মুনাফার হার বেঁধে দিয়ে কৃষি বিপণন আইনে দেওয়া ক্ষমতাবলে 'কৃষি বিপণন বিধিমালা ২০২১' জারি করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। 'কৃষি বিপণন আইন ২০১৮'-এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিপণন অধিদপ্তর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মুনাফার হার ধরে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করে আসছিল। এখন মুনাফার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দেওয়া হলো।

বিপণন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-১) মো. মজিবর রহমান ১৫ই নভেম্বর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা প্রতিদিন কৃষিপণ্যের যৌক্তিক দাম নিয়ে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করি। আমাদের লোকজন বাজার থেকে কৃষিপণ্যের পাইকারি দাম কালেকশন করেন। এরপর প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে কস্ট কত হতে পারে, এর মধ্যে পণ্যের দাম ছাড়াও দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ, শ্রমিকের মজুরি থাকে। এর সঙ্গে মুনাফা যোগ করে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করি। মুনাফার হারটা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দেওয়া, এটা মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়। এখন কৃষি বিপণন আইনের অধীনে বিধিমালায় মুনাফার হারটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এটাই চূড়ান্ত। কেউ এ নির্ধারিত হারের বেশি মুনাফা নিলে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে বলেও জানান তিনি।

বিধিমালায় বলা হয়েছে, ধান, চাল, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদক পর্যায়ে সর্বোচ্চ যৌক্তিক মুনাফার হার ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ও খুচরা পর্যায়ে সর্বোচ্চ হার ২৫ শতাংশ। পাট, চা, তুলা, তামাক ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল এবং সব ধরনের ডাল ও কলাইয়ের (খোসাসহ ও খোসা ছাড়া) ক্ষেত্রেও তিনটি পর্যায়ে যৌক্তিক মুনাফার সর্বোচ্চ হার হবে একই। তেলবীজ রাই, সরিষা, তিল, তিসি, বাদাম, নারিকেল, সূর্যমুখী, সয়াবিন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌক্তিক মুনাফার সর্বোচ্চ হার হবে উৎপাদক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ও খুচরা পর্যায়ে ৩০ শতাংশ। আখ এবং সব ধরনের গুড়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিক মুনাফার সর্বোচ্চ হার উৎপাদক পর্যায়ে ৩৫ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ ও খুচরা পর্যায়ে ৩০ শতাংশ। সব ধরনের ভাজা ও শুকনা ফলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফার হার উৎপাদক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ২০ ও খুচরা পর্যায়ে ৩০ শতাংশ। সব ধরনের তাজা ও শুকনা ফুল, ক্যাকটাস, অর্কিড, পাতাবাহার ও অন্যান্য এবং আলুসহ সব প্রকার শাকসবজির ক্ষেত্রে যৌক্তিক মুনাফার সর্বোচ্চ হার উৎপাদক পর্যায়ে ৪০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ২৫ ও খুচরা পর্যায়ে ৩০ শতাংশ। সব ধরনের মাছ (তাজা, শুকনা, লবণজাত ও হিমায়িত) ও অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে মুনাফার সর্বোচ্চ হার উৎপাদক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ ও খুচরা পর্যায়ে ২৫ শতাংশ। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ (কাঁচা) ও অন্যান্য মশলার ক্ষেত্রে মুনাফার সর্বোচ্চ হার উৎপাদক পর্যায়ে ৪০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ২০ ও খুচরা পর্যায়ে ৩০ শতাংশ এবং ধনিয়া, কালোজিরা, মরিচ (শুকনা) ও এ জাতীয় অন্যান্য মশলার ক্ষেত্রে উৎপাদক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ ও খুচরা পর্যায়ে সর্বোচ্চ মুনাফার হার হবে ২৫ শতাংশ। ডিম, দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য, সুপারি, পান, সব প্রকার ভুসি, ডাব, নারিকেল ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুনাফার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এসব কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে মুনাফার হার হবে উৎপাদক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ ও খুচরা পর্যায়ে ২৫ শতাংশ। চিড়া, মুড়ি, সুজি, সেমাই, আটা, ময়দা সব প্রকার কৃষিপণ্যের রস ও জুস, আচার, বেসন, চিপস, অন্য যে-কোনো প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যে সর্বোচ্চ মুনাফার হার উৎপাদক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ, পাইকারি পর্যায়ে ১৫ ও খুচরা পর্যায়ে ২৫ শতাংশ।

১৬ই নভেম্বর ২০২১ বান্দরবানে কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. সাইফুল আবেদীন

উৎপাদক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিধিমালায় বলা হয়েছে, কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও বিপণন খরচের সঙ্গে উল্লিখিত শতকরা হারে মুনাফা ধার্য করে যৌক্তিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। একইসঙ্গে কৃষিপণ্যের পাইকারি ক্রয়মূল্য (উৎপাদকের বিক্রয়মূল্য) ও বিপণন খরচের সঙ্গে শতকরা হারে মুনাফা ধার্য করে যৌক্তিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কৃষিপণ্যের খুচরা কারবারির ক্রয়মূল্য (পাইকারি বিক্রয়মূল্য) ও বিপণন খরচের সঙ্গে শতকরা হারে মুনাফা ধরে যৌক্তিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করবে।

বান্দরবানে কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ কেন্দ্র চালু

বান্দরবানে ক্ষুদ্র চাষিদের সুবিধার্থে সদর উপজেলার শ্যারণ পাড়ায় কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করা হয়েছে। এতে এই অঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন চা চাষিদের কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে চা কারখানায় পাঠানো সহজ হবে, বজায় থাকবে কাঁচা পাতা থেকে তৈরিকৃত চায়ের মান ও গুণাগুণ। ১৬ই নভেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অর্থায়নে নির্মিত 'সম্প্রীতি লিফ কালেকশন সেন্টার' নামের এই কেন্দ্র উদ্‌বোধন করা হয়। বাংলাদেশ চা বোর্ডের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. সাইফুল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, সম্প্রীতি লিফ কালেকশন সেন্টার চালুর ফলে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষিদের কাঁচা চা পাতা সংগ্রহ ও তা নির্দিষ্ট সময়ে চা কারখানায় পাঠানো সহজ হবে। এতে কাঁচা পাতা থেকে তৈরিকৃত চায়ের মান ও গুণাগুণ বজায় থাকবে। বান্দরবানে উৎপাদিত চা-কে ব্যাপক পরিচিতির জন্য স্পেশাল চা হিসেবে 'বান্দরবান টি' নামে ব্র্যান্ডিং করার বিষয়ে চা বোর্ডের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। এছাড়া বান্দরবানের ক্ষুদ্র পর্যায়ের চা চাষে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চলমান সহায়তা সবসময় অব্যাহত থাকবে বলে চাষিদের আশ্বস্ত করেন।

নাটোরে কৃষি প্রণোদনা পাচ্ছেন তিন হাজার ৭০০ কৃষক

চলতি রবি মৌসুমে নাটোর সদর উপজেলার তিন হাজার ৭০০ জন কৃষককে কৃষি প্রণোদনা প্রদান কর্মসূচির আওতায় সাতটি শস্য আবাদে সার ও বীজ দেওয়া হলো। ৮ই নভেম্বর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে মসুর, খেসারি, সরিষা বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির উদ্‌বোধন করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার মেহেদুল ইসলাম জানান, নাটোর পৌরসভা ও উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের তিন হাজার ৭০০ নির্বাচিত প্রান্তিক কৃষককে তাদের এক বিঘা করে জমি আবাদের প্রয়োজনীয় গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, সরিষা, মুগ, মসুর ও খেসারি ডাল বীজ এবং রাসায়নিক সার পর্যায়ক্রমে প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা নভেম্বর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ উপলক্ষে আয়োজিত 'Forging a CVF COP-26 Climate Emergency Pact' শীর্ষক সাইড ইভেন্টে সভাপতির বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদ বাড়াচ্ছে বড়ো দেশগুলো

বিশ্বে যে দেশগুলো কার্বন নির্গমন বেশি করছে, ক্ষতি প্রশমনে তারা প্রতিশ্রুতি না রাখায় ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো যে বিপদে পড়েছে, তা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্লাসগোয় কপ-২৬ সম্মেলনের পাশাপাশি ফোরামের সভাপতি হিসেবে ২রা নভেম্বর ৪৮ জাতি সিভিএফ নেতাদের সংলাপে তিনি একথা বলেন বলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা *বাসস* জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কার্বন নিঃসরণকারী গুরুত্বপূর্ণ উন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুত তহবিল না দেওয়ায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র দেশগুলোকে আরও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক পরিণতি মোকাবিলায় আমাদের নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে।

ছয় বছর আগে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো জলবায়ু ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বছরে ১০০ কোটি ডলারের তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এখনও তা পুরোপুরি সফল হয়নি। এই পরিস্থিতিকে 'দুঃখজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক' বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, পর্যাপ্ত, টেকসই ও সহজলভ্য জলবায়ু অর্থায়ন ছাড়া কার্যকর কর্মপরিকল্পনা সম্ভব নয়। তাই এটা দুঃখজনক এবং হতাশাজনক যে, এখন পর্যন্ত প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণেই অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে আমরা, সিভিএফ সদস্যরা, এই কপে ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরের অভিযোজন ও প্রশমনের ৫০:৫০ আনুপাতিক হারে প্রতিবছর মোট ৫০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিতরণ পরিকল্পনা মাফিক অর্থায়ন উন্নত দেশগুলোর কাছে দাবি করি।

'ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম লিডার্স ডায়ালগ : ফোর্জিং এ সিভিএফ-কপ-২৬ ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি প্যাক্ট' শীর্ষক এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এতে বক্তব্য রাখেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেওয়া নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিহ্রাসে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিহ্রাসে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে চলমান কপ-২৬ সম্মেলনের সাইড ইভেন্ট হিসেবে ৮ই নভেম্বর বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনে বাংলাদেশ প্রণীত ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে এই অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে কাজ করছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল থেকে ৪৪৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ৭৮৯টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড–ইডকল আয়োজিত 'বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সৌরচালিত সেচযন্ত্র ব্যবহার বিষয়ে সংলাপে' মন্ত্রী দেশের কৃষিতে সোলার প্যানেলের ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তায় বিশ্বব্যাংক ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

৪০ হাজার স্মার্ট প্রিপেইড মিটার স্থাপন

ঢাকা পল্লী বিদ্যুত সমিতি-৪-এর আওতায় কলাতিয়া জোনাল অফিসে ৪০ হাজার স্মার্ট প্রিপেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০ হাজার ৬৩৮টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (বিপিইএমসি)।

৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (বিপিইএমসি)-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার ফাইয়াদুজ্জামান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ৪ সুপারভাইজারসহ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ চট্টগ্রামে 'রিহ্যাব চট্টগ্রাম ফেয়ার ২০২১'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

৩২ জন দক্ষ টেকনেশিয়ান মাঠ পর্যায়ে স্মার্ট মিটারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪-এর আওতাধীন কলাতিয়া জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বলেন, স্মার্ট প্রিপেইড মিটার পরিচালনা করা অনেক সহজ।

জ্বালানি নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। জ্বালানি নিরাপত্তা সুসংহত করতে সরকার প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি করেছে। শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রায় সম্পন্ন। উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিক হতে অত্যাধুনিক করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামে 'রিহ্যাব চট্টগ্রাম ফেয়ার ২০২১'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, পরিকল্পিত নগরী গড়তে সরকারের পাশাপাশি রিহ্যাবেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ী ভবন করে বা নেট মিটারিং সিস্টেমকে ব্যবহার করে বা ড্যাব পর্যালোচনা করে সুষম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে রিহ্যাব কার্যকরী অবদান রাখতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন, Secondary Market করতে হলে আর্থিক সুবিধা সরকারকে বুঝাতে চেষ্টা করতে হবে। তিনি রিহ্যাবকে নিয়ম মেনে কাজ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রায়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ কার্যক্রমে রিহ্যাবের অবদান রাখা উচিত। এর আগে প্রতিমন্ত্রী রিহ্যাব চট্টগ্রাম রিজিওনাল অফিসের উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

জেল-জরিমানার বিধান রেখে পাস মহাসড়ক বিল

মহাসড়ক আইন অমান্য করলে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা দণ্ড আরোপের বিধান রেখে 'মহাসড়ক বিল ২০২১' পাস করেছে জাতীয় সংসদ। বিলে মহাসড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়েরও বিধান রাখা হয়েছে।

স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের ১৫তম অধিবেশনে ২৭শে নভেম্বর বৈঠকে বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এর আগে বিলের ওপর আনীত জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়। পরে কণ্ঠভোটে বিলটি পাস হয়। বিলে বলা হয়েছে, সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের অনুমতি ছাড়া মহাসড়কে কোনো বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, তোরণ বা অনুরূপ কিছু টাঙানো বা স্থাপন করা যাবে না। বিলে মহাসড়ক বা সড়কের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, অবৈধ দখল বা প্রবেশমুক্ত রাখার জন্য কী করণীয় হবে এবং সার্ভে করার জন্য মানুষের বাড়িতে কতদূর পর্যন্ত ঢুকতে পারবে সেসব বিষয়ে বলা হয়েছে। এছাড়া মহাসড়কের নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান দিয়ে পদযাত্রা করা যাবে না বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত উদ্দেশে মহাসড়কের কোনো স্থানে অবস্থান করা যাবে না। ধীর গতিসম্পন্ন যানগুলো মহাসড়কের নির্ধারিত লেন ছাড়া অন্য কোনো লেন ব্যবহার করতে পারবে না। নির্ধারিত জায়গা ছাড়া মহাসড়কে গবাদি পশু চরানো, প্রবেশ করানো, পারাপার করানো যাবে না। মহাসড়কে ফসল, খড় বা অন্য কোনো পণ্য শুকানো বা অনুরূপ কোনো কাজে মহাসড়ক ব্যবহার করা যাবে না। বিলে মহাসড়ক আইন অমান্য করলে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দণ্ড আরোপের বিধান রাখা হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, সরকার বা সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মহাসড়ক উন্নয়ন, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ, মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট স্যুয়ারেজ সিস্টেম, ড্রেন, কালভার্ট, সেতু নির্মাণ ও সংস্কার করবে। বিলে আরও বলা হয়, আইনের অধীনে গেজেট দিয়ে সরকার বলে দেবে কোনো সড়ক বা মহাসড়কে কে প্রবেশ করবে বা কে প্রবেশ করবে না, কোনটা মহাসড়কের সঙ্গে এক্সপ্রেসওয়ে হিসেবে ঘোষণা করা হবে, পরিচালনা কেমন হবে, কোনগুলোর টোল নেওয়া হবে।

বিলে নির্ধারিত মাশুল প্রদান সাপেক্ষে নাগরিক সেবা প্রদানকারী সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ইউটিলিটি সংযোগগুলো মহাসড়কের প্রান্তসীমা বরাবর স্থাপন করার বিধান রাখা হয়েছে। মহাসড়কের উন্নয়ন, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের সময় প্রয়োজন হলে ওই ইউটিলিটি সংযোগগুলো সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে নির্দিষ্ট সময়ে অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তর করবে।

বাস ও মিনিবাসের ভাড়া পুনঃনির্ধারণ

আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার রুটে ডিজেল চালিত বাস ও মিনিবাস চলাচলের ক্ষেত্রে যাত্রীপ্রতি কিলোমিটার সর্বোচ্চ ভাড়া ১.৮০ টাকা

পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ডিজেল চালিত বাস চলাচলের ক্ষেত্রে যাত্রীপ্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.১৫ টাকা এবং মিনিবাস চলাচলের ক্ষেত্রে যাত্রীপ্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.০৫ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভাড়া যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৮ টাকা।

ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ)-এর আওতাধীন জেলার (নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা) অভ্যন্তরে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাস উভয় ক্ষেত্রে ভাড়া যাত্রীপ্রতি কিলোমিটার ২.০৫ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। পেট্রোল, অকটেন ও গ্যাস চালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে বর্ধিত এ ভাড়া প্রযোজ্য হবে না। জনস্বার্থে জারিকৃত এ ভাড়ার হার ৮ই নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে ৭ই নভেম্বর এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

মানবদেহে বঙ্গভ্যাক্সের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ অনুমোদন

বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেকের তৈরি করোনার টিকা 'বঙ্গভ্যাক্স' মানবদেহে প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)। ২৩শে নভেম্বর এক চিঠিতে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিএমআরসি থেকে বলা হয়, ১০ শর্তে গ্লোব বায়োটিককে বঙ্গভ্যাক্সের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে– যারা স্বেচ্ছায় এ টিকা নেবেন, তাদের অধিকার ও কল্যাণের বিষয় নিশ্চিত করা; যারা নেবেন তারা জেনে-বুঝে টিকা নিচ্ছেন তা নিশ্চিত করা; টিকা গ্রহণকারী কোনো স্বেচ্ছাসেবকের ঝুঁকি সম্পর্কিত কোনো কিছুতে যদি পরিবর্তন আসে, তাহলে ন্যাশনাল রিসার্চ এথিকস কমিটিকে (এনআরইসি) জানানো ইত্যাদি। উল্লেখ্য, গ্লোব বায়োটিকের এই টিকা গত আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বানরের ওপর প্রয়োগ করা হয়। এ প্রয়োগের ফলাফল তারা বিএমআরসিতে জমা দেয় এবং মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য আবেদন করে ১লা নভেম্বর।

করোনার ওষুধ 'মলনুপিরাভির' এখন দেশের বাজারে

৪ঠা নভেম্বর করোনা চিকিৎসায় একমাত্র খাওয়ার ওষুধ 'মলনুপিরাভির' ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাজ্যের মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরি অথরিটি (এমএইচআরএ)। এরপর থেকেই বাজারে আসতে শুরু করেছে ওষুধটি দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে। ভাইরাস নিরোধ মুখে খাওয়ার এ ক্যাপসুলটি ইতোমধ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ওষুধের দোকানে পৌঁছে গেছে।

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ওষুধটি বাজারজাত করছে 'মনুভির' নামে। আর স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এটি বাজারজাত করছে 'মোলভির' নামে। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডও ওষুধটি বাজারজাত করেছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর দ্রুততার সঙ্গে আবেদন আমলে নিয়ে অনুমোদন প্রদান করায় ওষুধটি এত দ্রুত বাজারে এসেছে। করোনার উপসর্গ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রাপ্তবয়স্ককে সকালে চারটি ও রাতে চারটি ক্যাপসুল সেবন করতে হবে। এভাবে চলবে ৫ দিন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এ ওষুধ খাওয়া যাবে না। ১৮ বছরের নিচে কেউ এ ওষুধ খেতে পারবে না। এ তথ্য জানিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

উল্লেখ্য, করোনা নিরাময়ে 'মলনুপিরাভির' তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ কোম্পানি মার্ক ও রিজব্যাক বায়োথেরাপিউটিক যৌথভাবে। ওষুধটির ওপর পরীক্ষা হয়েছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ১৭টি দেশে।

টিকা পেলেন বস্তিবাসী

বস্তিবাসীর জন্য করোনার টিকাদান কর্মসূচির প্রথম দিনে রাজধানীর বনানীর কড়াইল বস্তির ৬ হাজার ৩২১ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নারী ৩ হাজার ৩২০ জন, পুরুষ ৩ হাজার ১ জন। ১৬ই নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এ টিকা দেওয়া হয়।

কড়াইল বস্তির বিভিন্ন জায়গায় ৮টি কেন্দ্রে ২৫টি বুথের মাধ্যমে অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকা দেওয়া হয়। এ কর্মসূচির আওতায় লক্ষাধিক বস্তিবাসীকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন

'ডায়াবেটিস সেবা নিতে আর দেরি নয়'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা দেশে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-২০১৮ অনুযায়ী, দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষ ১ কোটি ১০ লাখ। ১৮-৩৪ বছর বয়সিদের মধ্যে এই সংখ্যা ২৬ লাখ। আর ৩৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সিদের মধ্যে ৮৪ লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত।

ডায়াবেটিসের কারণে হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোক, কিডনি রোগ, চোখের রোগ, পঙ্গুত্ব ও মাড়ির রোগ হয়। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, মানুষের কায়িক পরিশ্রম কমে যাওয়া, জীবনযাত্রার ধরনের পরিবর্তনের কারণে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের অর্ধেকই জানেন না তাদের ডায়াবেটিস হয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো, এই না জানা। না জানতে পারলে তো প্রতিরোধ সম্ভব নয়। তাই ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-মালদ্বীপ রুটে ফ্লাইট চালু

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেন, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে আকাশপথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন দুই দেশের পর্যটন শিল্পকে উজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এভিয়েশন শিল্প প্রসারের সাথে

বাড়বে পর্যটন শিল্পের প্রবৃদ্ধি। ২৯শে নভেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ঢাকা-মালে রুটে ফ্লাইট উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ফ্লাইটটি শুক্র, মঙ্গল ও রবিবার চলাচল করবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশের এভিয়েশন শিল্প দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করছে। আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরের প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় তিনগুণ। বিপুল প্রবৃদ্ধির এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকারের আন্তরিকতায় দেশে ব্যাবসা ও বিনিয়োগের সবচেয়ে ভালো পরিবেশ বিরাজ করায় বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগের ভরসা পাচ্ছেন এবং স্বস্তি বোধ করছেন। অন্যান্য ব্যাবসার পাশাপাশি এভিয়েশন খাতেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত এয়ারলাইন্সের পাশাপাশি দুটি বেসরকারি এয়ারলাইন্সের পরিধি বেড়েছে। বর্তমানে তিনটি দেশীয় এয়ারলাইন্সের সাথে আগামী বছর আরও নতুন দুটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স দেশের এভিয়েশন শিল্পে যুক্ত হতে যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি পুনরায় চালু

২৬শে মার্চ দুষ্কৃতিকারীদের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি পুনরায় চালুকরণ-এর উদ্‌বোধন করেন রেলপথমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। মন্ত্রী ১৩ই নভেম্বর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে 'জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস'-এর যাত্রীদের ফুল দিয়ে গার্ড ব্রেকে ফ্ল্যাগ সিগনাল প্রদানের মাধ্যমে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে ট্রেনের যাত্রাবিরতি পুনরায় চালু করেন।

প্রায় আট মাস পর এটি আবার চালু করা হলো। তিনি বলেন, পূর্বে যেভাবে যাত্রাবিরতি ছিল আজ থেকে একইভাবে যাত্রাবিরতি করবে। স্টেশনে ১৪টি আন্তঃনগর, ৮টি মেইল এবং ৪টি কমিউটার ট্রেনের যাত্রাবিরতি রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্টেশনের উন্নয়ন কাজের উদ্‌বোধন

রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন ১১ই নভেম্বর মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৫৫টি স্টেশন আধুনিকায়ন, প্ল্যাটফরম শেড নির্মাণ, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ, স্টেশন প্ল্যাটফরম উঁচু করাসহ যাত্রী সাধারণের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্টেশন আধুনিকায়ন কাজের উদ্‌বোধন করেন। একটি বিশেষ ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে এসব স্টেশনের আধুনিকায়ন কাজের উদ্‌বোধন করেন তিনি।

১১ই নভেম্বর যেসব স্টেশনের আধুনিকায়ন কাজের উদ্‌বোধন করেন সেগুলো হচ্ছে– টাঙ্গাইল, জামতৈল, উল্লাপাড়া, বড়াল ব্রিজ, চাটমোহর, নাটোর, সান্তাহার, জয়পুরহাট বিরামপুর, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী ও ডোমার রেলওয়ে স্টেশন।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে ১৬ই নভেম্বর তার দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত Enrico Nunziata-এর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বলেন, মানব পাচারের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, অনিয়মিত অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করে বৈধভাবে বিদেশ যাওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এছাড়া, বৈঠকে তারা মানব পাচার প্রতিরোধ, গুণগত ও বৈধ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণ, বাংলাদেশের কর্মীদের দক্ষতার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে ১৬ই নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের তার অফিসকক্ষে ইতালির রাষ্ট্রদূত এনরিকো নুনজিয়াটা সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

মানোন্নয়ন, ইতালিতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং দুদেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বয়সে ছাড় পাচ্ছেন ব্যাংকের চাকরিপ্রার্থীরা

মহামারি করোনা পরিস্থিতির কারণে ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বয়সে ছাড় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২৫শে নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে। এই নির্দেশনা বাংলাদেশে কার্যরত সব তফশিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীর কাছে পাঠানো হয়েছে। ২০২০ সালের ২৫শে মার্চের পর থেকে যাদের চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স ৩০-এর বেশি হয়েছে বা হচ্ছে, তারা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জারি করা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবেন। চলতি বছরের ১৯শে আগস্টের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশনা দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক এ নির্দেশনা জারি করে। এর ফলে চাকরিপ্রার্থীরা করোনার কারণে বয়সের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২১ মাসের ছাড় পাবেন, যা ব্যাংকের চাকরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যেসব ব্যাংক কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি, সেসব ব্যাংককে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিতব্য বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৫শে মার্চ ২০২০ তারিখে নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শুভ জন্মদিন হুমায়ূন আহমেদ

রসবোধের সাথে অলৌকিকতার মিশ্রণে যিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি হুমায়ূন আহমেদ। ১৩ই নভেম্বর পালিত হয় তাঁর ৭৪তম জন্মদিন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর নেত্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ূন আহমেদ একাধারে ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, গীতিকার, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় দুই শতাধিক উপন্যাস লিখেছেন। *নন্দিত নরকে* উপন্যাস দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ চার দশকের

সাহিত্যজীবনে তিনি ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কারে। এর মধ্যে একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ও বাচসাস পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

অবিস্মরণীয় দীনেশ চন্দ্র সেন

বাংলার লোকসাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছেন দীনেশ চন্দ্র সেন। প্রাচীন বাংলার লোকসংস্কৃতির বিকাশে রয়েছে তাঁর অনন্য অবদান। গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তিনি পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। সেসব উপকরণের সাহায্যে লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। এই কীর্তিমান মানুষটির ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী ছিল ৩রা নভেম্বর। এ উপলক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা একাডেমি। একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষ থেকে অনলাইনে এ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফকির আলমগীরের স্মরণসভা

গণমানুষের শিল্পী ফকির আলমগীর। বাংলা গানকে ঘিরে ছিল তাঁর ক্লান্তিহীন স্বপ্ন। বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কাঁপিয়েছেন দেশ-বিদেশের মঞ্চ। এ বছরের ২৩শে জুলাই চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় একুশে পদকপ্রাপ্ত এই কিংবদন্তীর কণ্ঠ। প্রাণঘাতী করোনা কেড়ে নিল বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ফকির আলমগীরের প্রাণ। তাঁর প্রয়াণে ২৪শে নভেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে এক স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে। তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফকির আলমগীরের স্মৃতিচারণ করেন মঞ্চসারথী আতাউর রহমান, নাট্যজন মামুনুর রশিদ ও মুক্তিযুদ্ধ ট্রাস্ট্রি মফিদুল হকসহ আরও অনেকে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

অস্কারে বাংলাদেশের দুই ছবি

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের *রেহানা মরিয়ম নূর*-এর পর এবার অস্কারের মনোনয়নের টিকিট মিলল বাংলাদেশের আরেক চলচ্চিত্র *গোর*-এর। নাট্যজন গাজী রাকায়েত নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি ছবি এটি। এর মূল চরিত্রে আছেন তিনিই। আজমেরী হক বাঁধন অভিনীত *রেহানা মরিয়ম নূর* এবারের আসরে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম (বিদেশি ভাষার প্রতিযোগিতা) বিভাগে বাংলাদেশের ছবি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করলেও *গোর* যাচ্ছে সাধারণ ক্যাটাগরিতে। প্রতিবছরের মতো এবারও ৯৪তম অস্কার আসরের জন্য বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের উদ্যোগে গঠিত চলচ্চিত্র বাছাই কমিটি *রেহানা মরিয়ম নূর* পাঠিয়েছে। অপরদিকে সম্প্রতি জানা যায়, একই আসরের সাধারণ বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে *গোর*-ও। ছবিটি পরিচালনার পাশাপাশি এর কাহিনি, সংলাপ ও চিত্রনাট্য করেছেন নির্মাতা নিজেই।

চার মহাদেশে *মিশন এক্সট্রিম*

বাংলাদেশের সিনেমা *মিশন এক্সট্রিম* একযোগে চার মহাদেশে মুক্তি পাচ্ছে। বিশ্বের তিনটি মহাদেশে ৩রা ডিসেম্বর মুক্তি পায়

সিনেমাটি। এবার তাতে যুক্ত হলো ৪র্থ মহাদেশ! ইউরোপেও মুক্তি পেতে যাচ্ছে পুলিশ অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাটি। কপ ক্রিয়েশনের এই সিনেমা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে ৩রা ডিসেম্বর একই দিনে মুক্তি পায়।

প্রথমবারের মতো সেন্সরশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশি কোনো সিনেমা আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পেল। এসব দেশে সিনেমাটি দেখা যাবে বিখ্যাত সব মাল্টিপ্লেক্সে। যুক্তরাজ্যের পরিবেশনায় দায়িত্বে রয়েছে রিভেরী ফিল্ম বিডি আর ফ্রান্সে পরিবেশনা করছে লা পয়েন্ট মাল্টিমিডিয়া প্যারিস। সিনেমাটির অন্যতম পরিচালক ও প্রযোজক সানী সানোয়ার জানান, এই তালিকায় কিছুদিনের মধ্যে যুক্ত হবে সুইজারল্যান্ড, ইতালি, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, সুইডেনসহ আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ। এ বিষয়ে আলোচনা অনেকদূর এগিয়েছে। *মিশন এক্সট্রিম*'র কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা আরিফিন শুভ। কপ ক্রিয়েশনের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন– তাসকিন রহমান, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী, সাদিয়া নাবিলা, শতাব্দী ওয়াদুদ, মনোজ প্রামাণিক, ইরেশ যাকের, মাজনুন মিজান, এহসানুর রহমান, ইমরান সওদাগর প্রমুখ।

প্রতিবেদন : মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

ভৌগোলিক কারণে মাদক সমস্যার কবলে বাংলাদেশ

মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ মাদক সমস্যার কবলে পড়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। তিনি জানান, প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার থেকে দেশে মাদক প্রবেশ করে। ইয়াবা আসে মিয়ানমার থেকে। আর গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন ও ইনজেক্টিং ড্রাগ ভারত থেকে অনুপ্রবেশ করে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। ১৪ই নভেম্বর জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে এ সংক্রান্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করেন সরকার দলের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী।

ঐ প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, চলতি বছরের তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২৩ হাজার ৮০০টি মামলা দায়ের করে ৩১ হাজার ৫৪৫ জন মাদক চোরাকারবারিকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এসব মামলায় এক কোটি ৫৫ লাখ ৪৯ হাজার ৯৩৮ পিস ইয়াবা, ১১৬ দশমিক ১৮৭ কেজি হেরোইন, ২০ হাজার ৭৪২ কেজি গাঁজা, ৮১ হাজার ৪৮৪ বোতল ফেনসিডিল, ১৯ হাজার ২৪৮ অ্যাম্পল ইনজেক্টিং ড্রাগ এবং ৫৭ হাজার ৯৭১ বোতল বিদেশি মদ জব্দ করা হয়েছে।

৮ কোটি ২৫ লাখ টাকার গাঁজা ধ্বংস করল র‍্যাব

রাঙামাটিতে ৮ কোটি ২৫ লাখ টাকার গাঁজা ধ্বংস করেছে র‍্যাব। ২২শে নভেম্বর কাউখালী থানার জেবাছড়ি এলাকায় এগুলো ধ্বংস করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় জ্যোতিমান চাকমা (৩৬) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে। র‍্যাবের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড়ো গাঁজা ক্ষেত ধ্বংস করেছে তারা।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) নুরুল আবছার গণমাধ্যমকে বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব জানতে পারে, জেবাছড়ি এলাকায় ক্ষেত থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে শুকিয়ে বাজারজাত করার জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এসময় র‍্যাব অভিযান শুরু করলে কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী পালায়। পরে অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর প্রায় পাঁচ একর জমিতে চাষ করা গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। ধ্বংস করা গাঁজার মূল্য আনুমানিক ৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

গারোদের ওয়ানগালা উৎসব

গারোদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ওয়ানগালা। 'ওয়ানা' শব্দের অর্থ দেবদেবীর দানের দ্রব্যসামগ্রী আর 'গালা' অর্থ উৎসর্গ করা। দেবদেবীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও মনোবাসনার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন হয় এ উৎসবে। সাধারণত বর্ষার শেষে ও শীতের আগে নতুন ফসল তোলার পর এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এর আগে নতুন খাদ্যশস্য ভোজন নিষেধ থাকে এ সম্প্রদায়ের জন্যে। তাই অনেকেই একে নবান্ন বা ধন্যবাদের উৎসবও বলে থাকেন। গারোদের বিশ্বাস, 'মিসি সালজং' বা শস্য দেবতার ওপর নির্ভর করে ফসলের ভালো ফলন। নতুন ফল ও ফসল ঘরে উঠবে,

তার আগে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে শস্যদেবতার প্রতি। গারো সম্প্রদায়ের এটাই চল। তাই শস্যদেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও নতুন ফসল খাওয়ার অনুমতির জন্য নেচে-গেয়ে উদ্‌যাপন করা হয় ঐতিহ্যবাহী ওয়ানগালা উৎসব। একইসঙ্গে পরিবারের সদস্যদের মঙ্গল কামনা করা হয় শস্যদেবতার কাছে। ওয়ানগালা উৎসব একশ ঢোলের উৎসব নামেও পরিচিত। সাধারণত দুইদিন ধরে উৎসব চলে। কখনও কখনও এক সপ্তাহ ধরেও এটি চলতে থাকে। উৎসবের প্রথম দিনে গোত্রপ্রধানের ঘরে রাগুলা নামের অনুষ্ঠান পালিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন কাক্কাত নামে পরিচিত। এই দিন ছোটো-বড়ো সবাই রংবেরঙের পোশাক ও পাখির পালক মাথায় দিয়ে লম্বা ডিম্বাকৃতি ঢোলের তালে তালে নাচে। এই দিন হলো বিনোদনের দিন। সারা গারো পাহাড় ঢোলের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। পুরুষ ও নারীরা দুইটি আলাদা সারি গঠন করে এবং নাচের তালে তালে এগিয়ে যান। সাথে থাকে মহিষের শিঙে বানানো এক ধরনের আদিম বাঁশির সুর। ওয়ানগালা উৎসব মেঘালয় ও বাংলাদেশের গারোদের সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটা জনপ্রিয় একটি উৎসব। উৎসব ঘিরে ধর্মপল্লির পাশে গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও শিশুদের নানা রকমের খেলনা নিয়ে মেলা বসে।

প্রতিবছরের মতো এবারও শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা খ্রিষ্টরাজার পর্ব ও ওয়ানগালা উৎসব করেছে। ২১শে নভেম্বর দিনব্যাপী মরিয়মনগর সাধু জর্জের ধর্মপল্লির গির্জা চত্বরে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে ক্রুশচত্বরে বাণী পাঠ (মন্দিরে), খামালকে খুথুব ও থক্কা প্রদান, জনগণকে থক্কা দেওয়া, পবিত্র খ্রিষ্টযাগ, দান সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা করা হয়। গারো সম্প্রদায়ের কয়েকশো মানুষ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গারোদের নিজস্ব ভাষায় গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

আইজিসিসির আয়োজনে গারোদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বন্ধুপ্রতিম দুই দেশ বাংলাদেশ ও ভারত। আর এই উভয় রাষ্ট্রেই রয়েছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গারোদের আবাস। এই নৃগোষ্ঠীর রয়েছে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক সম্ভার। ঐতিহ্যবাহী সেই গারো সংস্কৃতির উদ্‌যাপনে ভিন্নধর্মী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ভারতীয় হাইকমিশন ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি)। একইসঙ্গে নাচ-গানে সজ্জিত গারোদের এই পরিবেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও মেলে ধরা হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গারোরা মূলত ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় ও বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়।

ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা বর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২৩শে নভেম্বর হেমন্ত সন্ধ্যায় গুলশানের ইন্ডিয়া হাউসে অনুষ্ঠিত আয়োজনটি হয়ে ওঠে গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক নীপা চৌধুরী। তিনি বলেন, গারো সম্প্রদায় ভারত-বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় বসবাস করেন। তাদের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। তবে পাশাপাশি দুই দেশের অভিন্ন সংস্কৃতিও এতে ফুটে ওঠে। তাদের এই পরিবেশনা দুটি দেশের সংস্কৃতিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। অনুষ্ঠানে গারো শিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে নিজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেন। এছাড়া, দলটি রাখাইন নৃত্যও পরিবেশন করে দর্শকদের মন মাতায়।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

টিকা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের নিজ স্কুলেই

সারা দেশে স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের করোনা প্রতিরোধী টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক। ১৮ই নভেম্বর রাজধানীর মহাখালীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর আয়োজিত 'বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ ২০২১' শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি এ কথা জানান।

মানিকগঞ্জে কর্নেল মালেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষামূলকভাবে করোনার টিকা দেওয়ার উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

মন্ত্রী বলেন, আমরা এতদিন চার-পাঁচটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের একটি স্কুলের মাধ্যমে টিকা দিয়েছি। এতে নিবন্ধনসহ নানা বিষয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় আমরা সারা দেশের প্রতিটি স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে নয় কোটি ডোজ টিকা ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

প্রাথমিক শিক্ষার্থী মূল্যায়নে নতুন নির্দেশ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। ডিপিই মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম স্বাক্ষরিত ২৩শে নভেম্বর এক আদেশে বলা হয়, স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

আদেশে আরও বলা হয়, ১৬ই মার্চ ২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠদান স্বাভাবিক ছিল। এরপর করোনা পরিস্থিতিতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিও এবং বিদ্যালয় থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তরা সম্পৃক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মকর্তাগণ বলেন, মূল্যায়ন করা মানে যে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নয়, বিভিন্নভাবেই মূল্যায়ন করা হতে পারে। যেমন– বাড়ির কাজ দেওয়া, সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কেমন করল তার মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। মূল্যায়নের ধরনটা স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করবে।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ উদ্যোগ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, বর্তমান সরকার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সৃজনশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১লা নভেম্বর প্রতিমন্ত্রী রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে জাদুঘর আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এ বিষয়ে বিশেষ বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ১লা নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দৃষ্টিজয়ী অভিহিত করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, তারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও মেধাবী। তাদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের পাশাপাশি দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি অসাধারণ হয়েছে ও উপস্থিত সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মননে প্রতিবন্ধী না হলে কোনো প্রতিবন্ধিত্বই প্রতিবন্ধিত্ব নয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং, জর্জ ওয়াশিংটন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রমুখ মনীষীগণের কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধিত্ব ছিল। তিনি বলেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Communication Disorder' বিভাগ খোলা হয়েছে যেটির উদ্‌বোধন করেছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

ই-কমার্সে প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে কর্মশালা

এটুআই এবং অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে ৩রা নভেম্বর ই-কমার্সে প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য একটি ভার্চুয়াল আলোচনাসভা এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে অসংখ্য প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তা তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাবসা উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের উদ্যোক্তা করার যাত্রা কোনোভাবেই মসৃণ ছিল না। তাদের চলার পথে রয়েছে নানা প্রতিকূলতা। এ প্রতিকূলতা দূর করতে ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিবন্ধী নারী উদ্যোক্তারা কীভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশের একমাত্র ই-কমার্স এগ্রিগেশন প্ল্যাটফরম 'একশপ'-এর মাধ্যমে বিক্রি করতে পারে সে বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এসময় ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), এটুআই-এর সভাপতিত্বে এবং মানিক মাহমুদ, হেড অব সোশ্যাল ইনোভেশন অ্যান্ড অপারেশন ক্লাস্টার, এটুআই-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাম চন্দ্র দাস, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিত্য কুমার রায়, প্রজেক্ট ডিরেক্টর, প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, প্রভাষ চন্দ্র রায়, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও আলবার্ট মোল্লা, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন।

ওয়েবিনারে আয়োজকদের পক্ষে এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক স্বাগত বক্তব্য দেন। আলোচনাসভায়

রেজওয়ানুল হক জামি, টিম লিড, রুরাল ই-কমার্স (একশপ) এবং ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, অ্যাকসেসিবিলিটি কনসালটেন্ট, কাস্টমার ইনোভেশন ল্যাব, এটুআই ই-কমার্সে সম্পৃক্ত হতে একজন উদ্যোক্তার কী কী দক্ষতা প্রয়োজন ও কী করণীয় সে বিষয়ে একটি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এবং নারী উদ্যোক্তাদের একশপ-এ যুক্ত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সিলেটে চালু হতে যাচ্ছে মূক ও বধির শিশুদের চিকিৎসা

সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী বা জন্মগত মূক ও বধির শিশুদের চিকিৎসার জন্য সিলেটেই এ চিকিৎসা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিরা এই চিকিৎসা সুবিধা পাবেন সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ডিসেম্বর মাসে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এ সেবা চালুর প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিভাগের প্রধান মনিলাল আইচ বলেন, বাংলাদেশে এক দশক আগেও কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট প্রতিস্থাপন চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। আগে ২৫-৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে বিদেশে এ চিকিৎসা অনেকে করাতেন। অথচ এখন দেশেই সরকারিভাবে তা সম্ভব হচ্ছে। এটি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বর্তমান সরকারের একটি বড়ো ধরনের সাফল্য। দেশে এখন এ চিকিৎসা বাবদ বেসরকারিভাবে ১০-১৫ লাখ টাকা খরচ পড়ে। অথচ সরকার বিনামূল্যে এ ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছে।

মনিলাল আইচ আরও বলেন, হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিভাগের অধীনে আলাদা একটা ইউনিট স্থাপন করে অস্ত্রোপচার কক্ষের নির্মাণকাজ এখন শেষ মুহূর্তে আছে। সব প্রস্তুতি শেষ করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ইউনিট চালুর সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়সি যেসব শিশু বধিরতায় ভোগে, এমন শিশুদের চিকিৎসায় কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমানে কেবল ঢাকাতেই এ চিকিৎসা হয়। ঢাকার বাইরে এই প্রথম সিলেট ও চট্টগ্রামে সরকারিভাবে এমন চিকিৎসা চালুর জন্য একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। গত অর্থবছরে সিলেটে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এতে প্রথম দফায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের কাজ চলমান থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও বরাদ্দ দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে শারমিনের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরি

হারারেতে গত ২৩শে নভেম্বর মেয়েদের ক্রিকেট ওডিআই বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করেন শারমিন। তার রেকর্ড রাঙানো দিনে বাংলাদেশ (৩২২/৫) ওডিআই স্ট্যাটাসবিহীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে (৫২/১০) হারিয়েছে ২৭০ রানের বিশাল ব্যবধানে। ওপেনার শারমিন ১৩০ রানে

অপরাজিত থাকেন। ১৪১ বলের ইনিংসে ১১টি বাউন্ডারি হাঁকান তিনি ২০২ মিনিট ক্রিজে থেকে।

দেড় যুগ পর মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় পেল বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজা পাকসে চার জাতি ফুটবল টুর্নামেন্টে মালদ্বীপকে ১-২ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। এতে ১৮ বছর পর মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় পেল বাংলাদেশ। ১৩ই নভেম্বর কলম্বোয় জামাল ভূঁইয়া দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা ফেরান মোহামেদ উমাইর। ২০০৩ সালের পর মালদ্বীপকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। ১৮ বছর পর জামাল-তপুদের হাত ধরে এলো এই জয়। এর আগে গত মাসে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এই মালদ্বীপের বিপক্ষে মালেতে ২-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।

এশিয়ান আর্চারিতে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশের তিরন্দাজরা

এশিয়ান আর্চারিতে ১৭ই নভেম্বর প্রথম পদক জিতল বাংলাদেশ। এদিন আর্মি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের রিকার্ভ বিভাগের পুরুষ ও নারী দলগত ইভেন্টে দুটি ব্রোঞ্জ জিতেছে স্বাগতিক তিরন্দাজরা। রিকার্ভ নারী দলগত ইভেন্টে ভিয়েতনামের তিরন্দাজদের ৫-৩

সেটে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন বাংলাদেশের দিয়া সিদ্দিকী, নাসরিন আক্তার ও বিউটি রায়। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে এটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম পদক। প্রথমবারের মতো পদক পেয়ে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। নারীদের দলগত ইভেন্টের পর রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে কাজাখস্তানকে ৬-২ সেটে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন রোমান সানা, হাকিম আহমেদ ও রামকৃষ্ণ সাহা।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক চলে গেলেন না ফেরার দেশে

আফরোজা রুমা

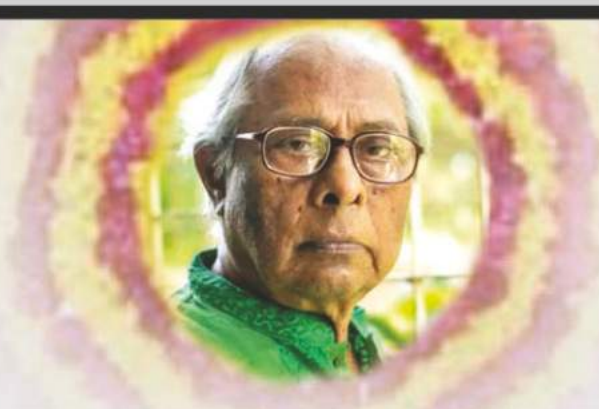

স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকজয়ী নন্দিত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৫ই নভেম্বর রাজশাহীর নিজ আবাসস্থল 'উজান'-এ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যা ছাড়াও হার্টে সমস্যা ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। শরীরে লবণের ঘাটতিও ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোহাম্মদ দোয়া বখশ্ এবং মায়ের নাম জোহরা খাতুন। তিনি ১৯৫৪ সালে যবগ্রাম মহারানী কাশীশ্বরী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৬ সালে খুলনার দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ (রাজশাহী কলেজ) থেকে দর্শনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাজশাহী সিটি কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ এবং সরকারি ব্রজলাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে রাজশাহীর দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে ৩১ বছর অধ্যাপনা করেন এই সাহিত্যিক। ২০০৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' পদে মনোনীত হন এবং দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালের আগস্টে হাসান আজিজুল হক বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিতে হাসান আজিজুল হক নিজ ভাষা ও চিন্তার মৌলিকত্বে বিশেষ অবস্থানের অধিকারী। ছোটোগল্পে তাঁর অসামান্য কুশলতায় তিনি জীবিত অবস্থাতেই কালজয়ী হয়ে ওঠেন। বাঙালির দ্রোহ, বঞ্চনা, প্রান্তিক মানুষের অনির্বাণ সংগ্রাম তাঁর সাহিত্যে বার বার বিষয় হয়ে আসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে– *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য*, *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*, *নামহীন গোত্রহীন*, *রাঢ়বঙ্গের গল্প*, *মা মেয়ের সংসার*, *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প*, *চালচিত্রের খুঁটিনাটি*, *একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা*, *সাবিত্রী উপাখ্যান*, *শামুক*, *শিউলি*, *চন্দর কোথায়*, জর্জ শেহাদের নাটকের ভাষান্তর *ফিরে যাই ফিরে আসি*, *উঁকি দিয়ে দিগন্ত*, *এই পুরাতন আখরগুলি*, *জন্ম যদি তব বঙ্গে*, *বং বাংলা বাংলাদেশ*। *আগুনপাখি* (২০০৬) তাঁর রচিত সাড়া জাগানো উপন্যাস।

সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে একুশে পদক পান। ২০১২ সালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ২০১৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি পুরস্কার হলো– বাংলাদেশ লেখক শিবির পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, দিবারাত্রির কাব্য সাহিত্য পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ), অমিয়ভূষণ সম্মাননা (জলপাইগুড়ি), গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সম্মাননা, হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার, সেলিম আল দীন লোকনাট্য পদক, শওকত ওসমান সাহিত্য পুরস্কার প্রভৃতি। সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দেয় দেশের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ২০১৯ সালে তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পান। ২০১১ সালে *উঁকি দিয়ে দিগন্ত* শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের জন্য তিনি ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

প্রখ্যাত এ কথাশিল্পীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক জানিয়ে বাণী দিয়েছেন।

১৬ই নভেম্বর দুপুর ১২টায় অধ্যাপক হাসান আজিজুল হকের মরদেহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শহিদমিনার প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত রাখা হয়। এরপর বাদ জোহর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 07, December 2021, Tk. 25.00

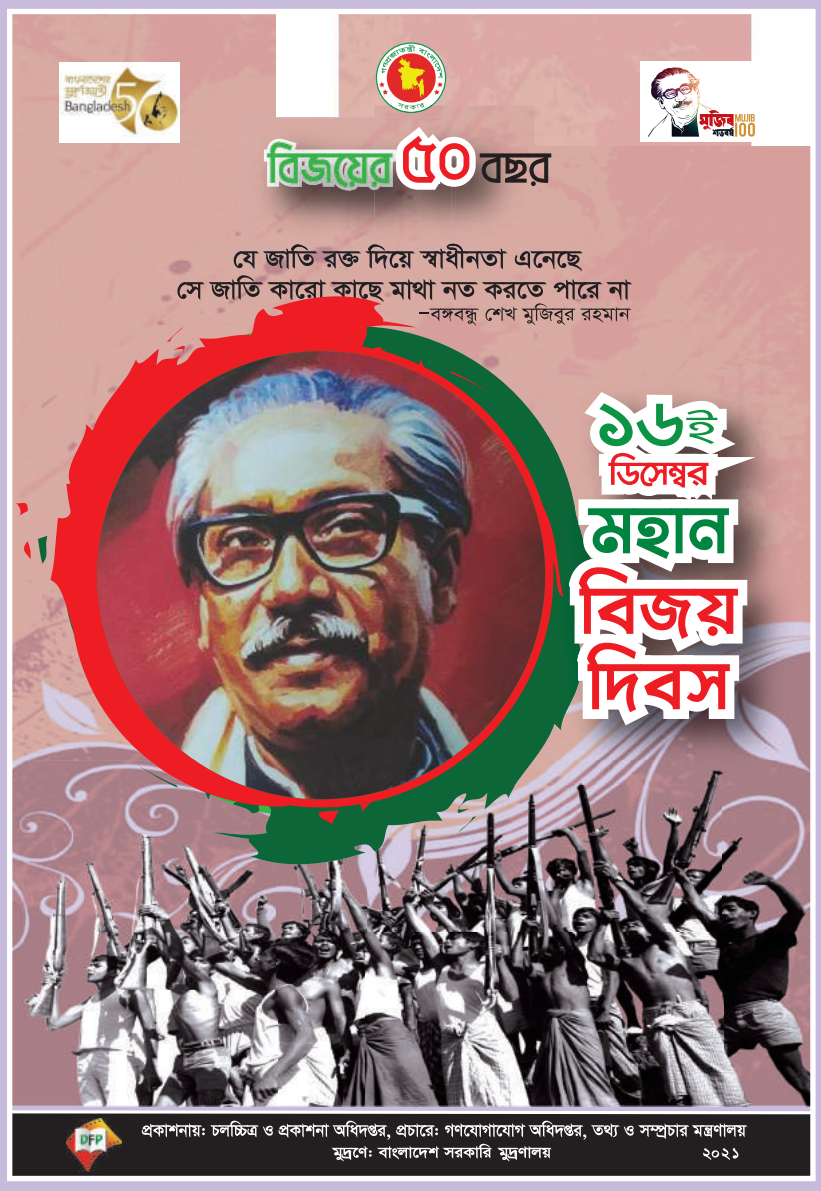

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd